যা শুনেছি যা জেনেছি

[প্রথম খণ্ড]

দীপেন রায়

বুক-লিঙ্কস্

কলিকাতা ৯

উৎসর্গ ঃ

শ্রীশ্রীসঙ্ঘনেতার রাতুল শ্রীচরণে
ভক্তি-অর্ঘ্যরূপে এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা
সমর্পিত হলো।

গ্রন্থকার

নিবেদন

যুদ্ধ ক্ষেত্রের সৈনিকদের মত সর্বদা তৈরি থাকতে হয় সেবাব্রতী সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের। সঙ্ঘের আদেশ পাওয়া মাত্রই তাঁদের ছুটতে হয় অকুস্থলে। নদ, নদী, নালা, পাহাড়-পর্বত, শহর, পাড়াগাঁ—সর্বত্র। অসাচ্ছন্দ, বিপদ, অপমান, এমনকি প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে পর্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে চলতে হয় তাঁদের। হাস্য, ভয়ঙ্কর, বীভৎস, করুণ ইত্যাদি বিভিন্ন রস-সিঞ্চিত ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের এই সব সর্বত্যাগী সেবা ও ধর্ম প্রচারক সন্ন্যাসীগণ। তাঁদের কাছ থেকে শোনা ও জানা কাহিনীগুলোর উপর ভিত্তি করেই বিভিন্ন ধরনের গল্পগুলো লেখা। তাই বইটির নামকরণ হল, 'যা শুনেছি যা জেনেছি'।

গল্পগুলো সঙ্ঘের মাসিক পত্র "প্রণবে" "তাঁদের কাছে শুনেছি" শীর্ষকে, ধারাবাহিক ভাবে বহুদিন প্রকাশ হয়েছে। এবং পাঠক পাঠিকাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তাঁদের অনেকেই গল্পগুলোকে পুস্তকাকারে প্রকাশিত দেখবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তাই তাদের অনুরোধ ও আগ্রহে 'যা শুনেছি যা জেনেছি' পুস্তকটি প্রণয়নে অগ্রসর হলাম। আরো অনেক কাহিনী রয়েছে যা প্রথম খণ্ডে প্রকাশ করা গেল না। দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে প্রকাশ করা হবে বলে আশা করি।

এই সব গল্পের রচনায় যারা উৎসাহ ও উদ্দীপনা যুগিয়েছেন তাঁদের মধ্যে সর্ব প্রথমে উল্লেখযোগ্য, শ্রীমৎ স্বামী বেদানন্দজী, স্বামী আত্মানন্দজী, স্বামী নির্মলানন্দজী। সাহিত্যরসিক ও সাহিত্যিকদের

মধ্যে রয়েছেন আমার অগ্রজ শ্রীনৃপেনচন্দ্র রাহা, বন্ধু শ্রীসুকোমল নাগ, শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী, শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ময়ী দেবী, বনফুল ও তাঁর সহধর্মিনী লীলা দেবী, প্রখ্যাত নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায়, শ্রীসুরেন নিয়োগী এবং আরো অনেকে। তবে 'প্রণবের' অন্যতম সম্পাদক স্বামী নির্মলানন্দজী মহারাজের উপদেশ ও অকুণ্ঠ সহযোগিতা পুস্তক রূপায়ণে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। এই প্রসঙ্গে ৺তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি এ গল্পগুলোকে পুস্তকাকারে প্রকাশ করার জন্য আমাকে বিশেষ ভাবে উৎসাহিত করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পুস্তকটি বিলম্বে প্রকাশ হওয়ার জন্য তাঁর করকমলে সমর্পণ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলাম।

বড় বড় সাধু সন্ন্যাসীদের জীবনের নানা কাহিনী ও অভিজ্ঞতার কথা নিয়ে নানা ধরনের বই আছে। সঙ্ঘের অক্লান্ত কর্মী, ধর্ম ও সমাজ-সেবী সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের বিচিত্র অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে লেখা এই বইটি উপরোক্ত বইগুলোর মধ্যে একটি ক্ষুদ্র অথচ অভিনব সংযোজনা।

'যা শুনেছি যা জেনেছি' যদি পাঠক পাঠিকাদের কাছে ভাল লাগে ও সমাদর লাভ করে তা'হলেই আমার প্রচেষ্টা সার্থক বলে মনে করব।

গ্রন্থকার

ভূমিকা

শ্রীদীপেন রাহার বইখানি মনোযোগের সহিত পড়লাম। খুব ভাল লাগলো। তাঁকে জানি বহুদিন থেকে। তাঁর পরিচয় সুন্দর। দীপেনবাবু কেবল মাত্র বিশিষ্ট সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিই নহেন, তিনি একজন সত্যিকার শুশ্রূষু ভক্তও বটেন। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের অধ্যাত্ম জীবন-ধারার সহিত গৃহী সাধকরূপে তিনি নিজেকে প্রত্যক্ষ ভাবে যুক্ত করেছেন, সংঘনেতা আচার্যদেবই তাঁর আরাধ্য দেবতা, সংঘের নবীন ও প্রবীণ সন্ন্যাসিগণই তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিজন। দীক্ষা-মন্ত্রাদি গ্রহণপূর্বক গতানুগতিক ভাবে কিঞ্চিৎ জপ-তপ সমাধা করেই যাঁরা ভক্তের পাকা খাতায় নাম লিখিয়ে খুসী হন, দীপেন বাবু সেই শ্রেণীর স্বল্পতুষ্ট গৃহী ভক্ত নহেন। তিনি জিজ্ঞাসু ও শুশ্রূষু; তিনি জানতে চান, শুনতে চান; তিনি জ্ঞানী ভক্ত; ভাবুক ভক্ত। তাই দেখি, যখনই আশ্রমে আসেন তখনি সপরিবারে ঘুরে বেড়ান সংঘ-সন্ন্যাসীদের দ্বারে দ্বারে একান্ত উৎসুক চিত্তে; আর উৎকর্ণ হয়ে বসে থাকেন প্রবীণতম সন্ন্যাসী মহারাজদের শ্রীপদপ্রান্তে—শ্রীরাম-কথা শ্রবণপিপাসু বীর অঞ্জনা-তনয়ের মত। সংঘের পুরাতন স্মৃতি-কথা, শ্রীশ্রীসংঘনেতা আচার্যদেবের দিব্যলীলার অমৃতোপম কাহিনী, সংঘের শ্রেষ্ঠতম সন্ন্যাসীদের ত্যাগপূত তপোময় কর্মজীবনের বিচিত্র ঘটনার কথা দিনের পর দিন শুনেও যেন তাঁর তৃপ্তি নেই, বিশ্রাম নেই; আরো-আরো শুনতে চান, শুনতে চান যাঁদের কথা তাঁদেরই শ্রীকণ্ঠে। এমনি ভাবে অনেক কাহিনীই তিনি শুনেছেন। শুনে শুনে নিজের স্মৃতির ঝুলি পূর্ণ করেছেন। এবার অগ্রসর হয়েছেন ঝুলি ঝাড়ার মহৎ কার্য্যে-শ্রবণের পর কীর্তনের জমাট আসরে।

হাঁ, সঙ্গত কার্যই বটে। ভক্তির প্রথম লক্ষণ শ্রবণ। কিন্তু নিজে শুনে তৃপ্ত হয়েই যিনি মূক হয়ে বসে থাকেন, তিনি চরম স্বার্থপর, তাঁর ভক্তি-সাধনা নিঃসন্দেহে সংকীর্ণতা দোষে দুষ্ট। তাই শ্রবণের পর কীর্তন করতে হয়, আরো দশ জনের কাছে বলতে হয়, যাতে তারাও আনন্দ পায় এবং অনুপ্রাণিত ও ভগবদ্‌মুখী হতে পারে। লক্ষ্য করে প্রীতি লাভ করছি যে, দীপেন বাবু এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন। নিজের আনন্দকে সকলের মধ্যে বিলিয়ে দিতেই তাঁর এই ঝুলি ঝাড়ার পবিত্র ব্রত গ্রহণ।

"যা শুনেছি, যা জেনেছি" গ্রন্থখানি দীপেন বাবুর অন্যতম সার্থক সৃষ্টি। কোন বৃহৎ ও স্মরণীয় কাহিনী নিয়ে তিনি কার্যে অবতীর্ণ হননি-সংঘ-সন্ন্যাসীদের জীবনের ছোট ছোট কথাই বেশীর ভাগ তাঁর গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। ছোট হলেও ঘটনাগুলি বিচিত্র ও মনোগ্রাহী এবং বহু স্থলেই শিক্ষাপ্রদ ও শ্রীগুরুর মহিমা প্রকাশক। অথচ, এ গুলি নিয়ে এ পর্যন্ত অন্য কেউ মাথা ঘামান নি, সন্ন্যাসীদের অবসর বিনোদনের বৈঠকেই এ সকল কাহিনী মুখে মুখে কথিত ও আলোচিত হয়ে আসছে। সেই সব কাহিনীকেই গ্রন্থের প্রধান উপজীব্য করায় দীপেন বাবুর কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে। এ প্রচেষ্টা অভিনব, এ দৃষ্টিভঙ্গী সুন্দর। সহজাত সাহিত্য-প্রতিভার সহিত অন্তরের স্বতঃউৎসারিত শুদ্ধা ভক্তিধারা সমন্বিত হয়ে তাঁর রচনা এক অনবদ্য প্রাণধর্মে উজ্জীবিত হয়েছে। সব লেখাগুলিই রসোত্তীর্ণ। আমাদের ছোট ছোট ঘরোয়া কথা গুলিকে আমরাও কোন দিন তেমন আমল দিইনি, অতি সাধারণ ও উপেক্ষণীয় বলেই মনে করেছি। কিন্তু সুসাহিত্যিক শ্রীদীপেন রাহা সেই সব আপাত-সাধারণ ঘটনাবলী থেকেই অসাধারণ তাৎপর্য ও করুণ, বীর, হাস্যাদি রস নিষ্কাষণপূর্বক ভক্ত-সমাজে পরিবেশনে নিরত হয়েছেন।

হাঁ, ঠিকই করেছেন। ভাবুক ও জ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গী এরূপই হয়। আরাধ্য প্রাণদেবতার কৃপা-মহিমা ও লীলা-মাধুর্যের সঙ্গে সংযুক্তি আছে এমন ক্ষুদ্রতম ও তুচ্ছতম ঘটনাও তাঁদের দৃষ্টি কদাপি এড়ায় না। ইষ্টনিষ্ঠার গাম্ভীর্যে সে সকলই সুন্দর, সকলই মহৎ হয়। আরাধ্যের প্রিয় পরিকরদের স্মৃতিকথাও তাঁদের কাছে অপ্রাকৃত ভাবের প্রকৃষ্ট পরিপোষক। ঐ সকল কাহিনীর শ্রবণ, মনন, কীর্তন, নিদিধ্যাসনে তাঁরা সমগ্র জীবন কাটিয়ে দিতে পারেন, সংসারাসক্তি ভুলে যেতে পারেন, আত্মনিষ্ঠায় সুপ্রতিষ্ঠিত থাকতে পারেন!

দীপেন বাবুর লেখা পড়ে অভিভূত হয়েছি, ভক্ত ও সাহিত্য-রসিকবৃন্দ পরিতৃপ্ত হবেন এ বিশ্বাস পোষণ করি। লেখার সহজ ভঙ্গিতে ঘটনাগুলি গল্পের মতই সুন্দর হয়েছে। অথচ এগুলি রূপকথার কল্পিত কাহিনী নয়, পরন্তু বাস্তব জীবনের সত্য ইতিহাস, সেবাব্রতী সংঘ-সাধকগণের সুখ-দুঃখ, সম্পদ-বিপদ, পুরস্কার-তিরস্কারের সংঘাতময় জীবনের মহিমান্বিত চিত্র। এ চিত্র চিত্রণের আবশ্যকতা ছিল।

কৃতী লেখক দীপেন বাবুকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। তিনি আরো শুনুন, আরো জানুন, আরো লিখুন। সংঘের পুরাতন দিনের অনেক কথাই অদ্যাপি সম্যক বলা হয়নি। এ কাজ অফুরন্ত। দীপেন বাবুর মত সক্রিয় ভক্ত সাহিত্যিকেরা এগিয়ে এলে সে অসম্পূর্ণ ব্রত-সাধন নিশ্চিতই ত্বরান্বিত হবে।

ইতি—

স্বামী-নির্মলানন্দ
ভারত সেবাশ্রম সংঘ
২১১, রাসবিহারী এভিনিউ,
কলিকাতা ১৯

লেখকের অন্যান্য প্রখ্যাত বই ঃ

কাঁচামাটি পাকাপথ (উপন্যাস)

আদর্শ বেকার সঙ্ঘ (উপন্যাস)

জানা অজানা (ভ্রমণ কাহিনী)

নিতবর (ছোটগল্প সংকলন)

নতুন আলো (একাঙ্কিকা)

সরস ছোট গল্প (যন্ত্রস্থ)

'যা শুনেছি যা জেনেছি' সম্বন্ধে প্রখ্যাত সাহিত্যিক 'বনফুল' বলেন ঃ

'যা শুনেছি যা জেনেছি' বইটি নূতন ধরনের। যদিও এটি গল্প সংকলন, তবু এ গল্পগুলি সত্য ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত। লেখক শ্রীদীপেন রাহা একজন সুরসিক গল্পকার এবং ঔপন্যাসিক। মাত্রা বজায় রেখে কোথায় কতটুকু বলতে হয় তা তিনি জানেন। সেই জন্য গল্পগুলি খবরের কাগজের রিপোর্ট না হয়ে রসোত্তীর্ণ সাহিত্য হয়েছে।

ভারত সেবাশ্রম সংঘের সন্ন্যাসীরা সারা ভারতের নানা যায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। তাঁদেরই প্রচার কাজের বিভিন্ন সময়ে ঘটনাগুলি ঘটেছিল। দীপেনবাবু সেগুলো সংগ্রহ করে তার একটা সাহিত্য রূপ দিয়েছেন। এগুলো পড়ে আমরা শুধু গল্পের রসই উপভোগ করব না, আমরা জানতে পারব আমাদের এই ভারতবর্ষে কতরকম লোকই না আছে।

ছেলেবেলায় একটি ইংরেজি বই পড়েছিলাম। জর্জ বরোর বাইবেল ইন্ স্পেন। বাইবেল প্রচার করতে গিয়ে একজন পাদরি কি কি ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিলেন তারই রসোত্তীর্ণ ঘটনায় সমৃদ্ধ বইখানি। দীপেনবাবু এই বইটিতে বিস্তৃততর ভৌগলিক পটভূমিকা আঁকবার চেষ্টা না করে ঘটনার গল্পগুলো বলেছেন। একজন নিপুণ, রসিক কাহিনীকারের কলম দিয়ে বেরিয়েছে বলে গল্পগুলো সার্থক, মনোরম ও রসোত্তীর্ণ হয়েছে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই বইটি সম্যক সমাদৃত হবে।

বনফুল

(শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়)

'যা শুনেছি যা জেনেছি' বই এর জন্য লিখুন

দে বুক ষ্টোরর্স :
৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

নাথ ব্রাদার্স :
৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

প্রকাশ ভবন :
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

শ্রীগুরু লাইব্রেরী :
২০৪, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

ডি, এম, লাইব্রেরী :
৪২, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

সূচীপত্র

ছানা পুরাণম্

প্রচার-দলকে অনেকটা যাযাবরের মত ঘুরে বেড়াতে হয়। দেশ দেশান্তরে। অজানা অচেনা পরিবেশে। ঘুরে ঘুরে সঙ্ঘের দলটি এল গুজরাটের এক ছোট্ট শহরে। শহরটি ছোট, তাই দেখতে দেখতে সন্ন্যাসীদের আগমনবার্তা ছড়িয়ে পড়ল মুখে মুখে। পল্লীতে পল্লীতে। ধর্মপ্রাণ নর-নারীর দল এসে ভীড় করল সন্ন্যাসীদের ডেরায়। তাঁদের আগ্রহ ও ব্যাকুলতা দেখে খুশী হলেন সঙ্ঘ-সন্তানগণ।

ভক্তরা আবদার জানালেন :

—স্বামিজী, আমরা একটা উৎসব করব। যাগযজ্ঞের জন্য বন্দোবস্ত করুন। আমরা সব ব্যয়ভার বহন করব। ভক্তদের আগ্রহ দেখে দলপতি স্বামিজী বললেন :

—বেশ তো আয়োজন করুন। কালই যজ্ঞ হবে।

স্বামিজীর অনুমতি পাওয়া মাত্রই আনন্দের সাড়া পড়ে গেল ধর্মার্থীদের মধ্যে। পূজা, হোম, যজ্ঞানুষ্ঠানের যোগাড় শুরু হল। খবর পেয়ে একজন ধনী ব্যবসায়ী ছুটে এলেন, বললেন :

—স্বামিজী, আমার একটা নিবেদন আছে। উৎসবের দিনে যত ছানা লাগবে সব আমি দেব।

—ছানা ?

বাঙ্গালী সন্ন্যাসীরা এই জিনিসটির সঙ্গে বিশেষ পরিচিত। ভোগের জন্য উৎকৃষ্ট জিনিস তৈরি করা যাবে ছানা দিয়ে। খুশী হয়েই সম্মতি দিলেন স্বামিজী।

—বেশ তো পাঠাবেন, কালই উৎসব হবে। দেখবেন, সময় মত যেন জিনিসটি আসে। সকাল আটটার মধ্যে।

—নিশ্চয়ই।

বেশ জোর দিয়ে বললেন ব্যবসায়ী ভদ্রলোক।

ভদ্রলোক সন্ন্যাসীদের প্রণাম করে বেরিয়ে গেলেন।

ভদ্রলোক বেরিয়ে যেতেই সন্ন্যাসী ও উৎসবের কর্মীদের মধ্যে কথা হল।

প্রচুর ছানা আসবে যখন তখন বিভিন্ন রকম ছানার সন্দেশ ও মিষ্টি তৈরি করে গুরু মহারাজের ভোগ নিবেদন করা যাবে। তা ছাড়া ভক্তদেরও ছানার তৈরি প্রসাদ দেওয়া যাবে। কাজেই সব্জীর পরিমাণ কম হলেও চলবে।

খুশী হওয়ারই কথা।

পরদিন ভোর থেকেই পূজা ও যজ্ঞের আয়োজন শুরু হল। সন্ন্যাসীরাও নির্দিষ্ট কাজে এগিয়ে এলেন। হোমের কাঠ ও অন্যান্য জিনিস সবই যোগান দিলেন পল্লীর ভক্তগণ। কিন্তু এল না ভোগের মিষ্টি তৈরি করার জন্য সেই প্রতিশ্রুত ছানা। এদিকে ঘড়ির ঘণ্টার কাঁটা আটের ঘর পেরিয়ে ন-এর ঘর ছুঁই-ছুঁই করছে। শবরীর প্রতীক্ষার মত প্রতীক্ষা করছেন সন্ন্যাসীগণ।

কী হল? নিশ্চয়ই কোন অসুবিধে বা বিপদ ঘটেছে ভদ্রলোকের। এমন নিশ্চিত কথা দিয়েও ছানা পাঠালেন না কেন? এদিকে খাবারের ফর্দ তৈরি হয়ে গেছে। চিনিরও যোগাড় হয়েছে।

কিন্তু কোথায় সে ঈপ্সিত উপকরণ? না, আর দেরী করা চলে না। স্বামিজী স্থির করলেন একজন স্থানীয় লোককে পাঠিয়ে সেই ব্যবসায়ী ভদ্রলোকের খবর নেবেন। কিন্তু তা করতে

হল না! সেই ভদ্রলোক নিজেই এসে হাজির হলেন! তাঁকে দেখেই সহাস্যে প্রশ্ন করলেন স্বামিজী।

—কী হল আপনার ছানা পাঠাবার? এদিকে অন্য সব আয়োজন তৈরি।

প্রশ্নটা শুনেই ভদ্রলোকের চোখ দুটো ছানা বড়া হয়ে গেল। ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি।

—ছানা পাননি এখনও?

—না।

—বলেন কি? আমার সঙ্গে আসুন দয়া করে। বলেই ভদ্রলোক ব্যস্ততার সঙ্গে পা বাড়ালেন বাইরের একটা ঘরের দিকে। স্বামিজী ইতস্ততঃ করছেন দেখে একপ্রকার জিদ করেই তাঁকে নিয়ে গেলেন ভদ্রলোক ছানার ভাণ্ডারে। এসে একটা পরিত্যক্ত আধ ভাঙা ঘর অঙ্গুলি নির্দেশে দেখিয়ে সগর্বে বললেন:

—এই দেখুন কত ছানা মজুত রয়েছে।

ছানার নমুনা ও পরিমাণ দেখে স্বামিজী হতবাক। এ যে বাংলার প্রখ্যাত দিশি, জ্বালানী, ঘুঁটে। হাসি পেল স্বামিজীর। ভদ্রলোক মনে করলেন ছানার পরিমাণ কম মনে করে হয়ত স্বামিজী হাসছেন। তাই নিশ্চিন্ত করার জন্য সগর্বে বললেন:

—এ তল্লাটে আমিই ছানার সব চাইতে বড় স্টকিস্ট। যত চান দেব। ভাবনা কী?

বাংলাদেশের ঘুঁটে এ দেশের ছানা। বিদ্ঘুটে ব্যাপার।

স্বামিজীর মনে পড়ল সেই প্রবাদ বাক্যটা।

"এক দেশের বুলি, অন্য দেশের গালি।"

———

তালে-বেতাল

কাথিয়াবাড় শহর। সঙ্ঘ-সন্তানরা ভাবছেন কোথায় উঠবেন! কে ঠাঁই দেবে এই অচেনা শহরে! খুঁজে পেতে শেষে এসে উঠলেন একটি খালি বাড়ীতে। মন্দিরের পাশেই বাড়ী। শান্ত পরিবেশ। নির্বিঘ্নেই চলবে পূজা, ভজন, কীর্তন। সন্ন্যাসীরা খুশী। প্রচার কাজ নির্বিঘ্নেই চলছে। নিয়ম মাফিক সবই হচ্ছে। এর চাইতে বেশী সুযোগ সুবিধা আশা করা যায় না বিদেশ বিভূঁয়ে।

সেদিন বাজারে গিয়ে দুটি পাকা তাল পেলেন সন্ন্যাসী। তাল দুটি বেশ বড় এবং পছন্দসই। কিনে নিয়ে এলেন। স্থির হল, তালের বড়া তৈরি হবে। বসে গেলেন সন্ন্যাসী বাড়ীর উন্মুক্ত বারান্দায় তালের বড়ার উপকরণ নিয়ে, তার মধ্যে তালের বড়া ও ক্ষীর দিয়ে আজ ভোগ দেওয়া হোক গুরুমহারাজের।

হঠাৎ কুক্ষণের দুষ্টগ্রহের মত কয়েকজন স্থানীয় ব্যক্তি এসে হাজির হল রণচণ্ডী মূর্তি নিয়ে, চেঁচিয়ে সমস্বরে বলে উঠল তারা ঃ

—নিকলী যাও, হমনাজ হটি যাও।

অর্থাৎ বেরিয়ে যাও, এক্ষুণি বেরিয়ে যাও এখান থেকে।

স্বামিজীরা ভেবে পেলেন না হঠাৎ এমন কি কারণ ঘটল যে এক্ষুণি বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে হবে। পরস্পর পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগলেন। তারপর জনতার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন। জানতে চাইলেন হঠাৎ বিরাগভাজন হওয়ার কারণটা।

ততক্ষণে তেলের কড়াই উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। তেল টগবগ করে ফুটছে। এখন কখন পিঠে তাল পড়ে সেই দুঃশ্চিন্তা প্রবল।

জনতা ধীরে ধীরে আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। বিকট চীৎকার ও অঙ্গভঙ্গি শুরু করল। নিজস্ব রূঢ় ভাষায় ঘন ঘন প্রতিবাদ জানাতে লাগল। শেষে অনেক কষ্টে বোঝা গেল তাদের দাবীর রকমটা। আগে তাল বিদায়, পরে অন্য কথা।

সহাস্যে সন্ন্যাসীদের প্রচারকর্ত্তা বললেন :

—বেশ তো এক্ষুণি ফেলে দিচ্ছি তাল। আপনাদের সুমুখেই।

ক্ষিপ্র হস্তে একজন ব্রহ্মচারী তালের আঁটি, খোসা ও গোলা রস বাইরে ঢেলে ফেলে দিলেন। তারপর স্থানটি ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে ফেললেন। জনতাকে উদ্দেশ্য করে বললেন :

আপনাদের ইচ্ছাই পূরণ করা হয়েছে। আশা করি এবার আপনারা খুশী।

উত্তরে একজন নাসিকা কুঁচকে বলল :

—তমে হিন্দু নথী, তমে ছো মুসলমান।

সঙ্ঘ সন্তানগণের কাছে রহস্যটা আরো ঘোরাল হয়ে উঠল। হিন্দু সন্ন্যাসীরা মুসলমান? এ কি কথা? এ কি অদ্ভুত অভিযোগ? লোকগুলির মাথা খারাপ নাকি? মুসলমানী আচরণটা কোথায় দেখল তারা?

দোষটা বেশীক্ষণ খুঁজে বেড়াতে হল না। জনতার মধ্য থেকে একজন এগিয়ে এসে সন্দেহ ভঞ্জন করে দিল। অপরাধটা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।

—তাল কখনও হিন্দুরা খায় না, খায় শুধু মুসলমানরা। কাজেই তোমরা হিন্দু নও।

এতক্ষণে অপরাধের গুরুত্বটা বুঝলেন সন্ন্যাসীরা। অন্য সময় হলে হয়ত অভিযোগটা হেসে উড়িয়ে দিতেন। কিন্তু 'মানুষ অবস্থার দাস'। তাই চুপ করে ব্যাখ্যানা শুনলেন। তাল নিয়ে

অনেক রকম ঝগড়াই হয়েছে তার্কিক পণ্ডিতদের মধ্যে, কিন্তু এ রকম অদ্ভুত কথা কখনও শোনা যায়নি।

অবশ্যই হিন্দুর পুরাণে তালনবমীর ব্রতের কথা উল্লেখ আছে, কিন্তু হিন্দুর খাওয়া বারণ এমন কথা লেখা নেই, অন্ততঃ বাংলা দেশের পুরাণে ও বাঙ্গালীর অভিধানে।

বামাল বিসর্জন দিয়েও রেহাই পাওয়া গেল না। জেদ ধরল জনতা। এক্ষুনি সকলের সুমুখে সন্ন্যাসীদের অপরাধ কবুল করতে হবে।

কসুর স্বীকার করতে হবে। নইলে ক্ষমা নেই।

অগত্যা স্বীকার করতে হলো।

—হ্যাঁ, কসুর হয়েছে বলেই তারা ধরে নিল।

অবশ্য কসুর কবুল করার পর তাল-বৈরির দল বিদেয় নিল। কিন্তু তাও একটা সর্তে। এই বাড়ীতে থাকা চলবে না। এক্ষুণি অন্যত্র যেতে হবে। নইলে সংলগ্ন দেবালয় অপবিত্র হয়ে যাবে। আবার পথে নামতে হল সন্ন্যাসীদের। তালে সব বেতাল করে দিল।*

---

* সঙ্ঘের প্রচার দলনেতা শ্রীমৎ স্বামী বিকাশানন্দজী মহারাজ।

নিশানা

—শুনছ বাবা, আমার দলের লোক হারিয়ে গেছে।

বৃদ্ধা কাতর ভাবে বললেন এক সঙ্ঘ-সন্তানকে।

—সঙ্গে কে আছে ?

—আছে বারোজন। এক সঙ্গেই বের হয়েছিলাম আমরা তের জন। কোথায় তাঁরা আছেন জানিনে। অনেক খুঁজেছি। এক ডজন লোক হারিয়ে গেল, চোখের উপর !

—পুরুষমানুষ কেউ সঙ্গে ছিল ?

—না, ওদের কাউকে আনিনি বাবা। সব সময় টাকা দাও পয়সা দাও বলে জ্বালাতন করে। এখন দেখছি.........

সন্ন্যাসী ভাবনায় পড়লেন। বিরাট কুম্ভমেলায় কোথায় খুঁজে পাবেন তিনি বৃদ্ধার সঙ্গিনীদের ! একটু ভেবে নিয়ে আবার জিজ্ঞেস করলেন।

—কোন পাণ্ডা ছিল সঙ্গে ?

—না। আমরা নিজেরাই ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। ভিড়ের চাপে ওরা হারিয়ে গেল।

সন্ন্যাসী হেসে বললেন, ওরা হারায় নি, আপনি হারিয়ে গেছেন।

প্রতিবাদের সুরে বললেন বৃদ্ধা, না আমি হারাই নি।

হাসিটা চেপে সন্ন্যাসী আবার জিগগেস করলেন, কোথায় উঠেচেন ?

—এক পাণ্ডার বাড়ী।

—তার নাম জানেন ?

—না বাবা, নাম ঠিকানা যার কাছে—তিনিও হারিয়ে গেছেন। তাঁকে পেলেও হয়।

—তাঁর কী নাম ?

—ভাল নাম তো জানিনে। সুধীর মা বলেই আমরা ডাকি। খুব ভাল লোক।

হরিদ্বারের কুম্ভমেলায় সুধীর মাকে খুঁজে পাওয়া কী দুরূহ ব্যাপার সন্ন্যাসী তা জানেন। পৃথিবীর কেন্দ্র খুঁজে বার করা এর চাইতে অনেক সহজ কাজ।

অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন বৃদ্ধা সন্ন্যাসীর মুখের দিকে।

—আচ্ছা যে পাণ্ডার বাড়ীতে উঠেছেন, সেটা কতদূরে মনে হয় ? কতক্ষণ সময় লেগেচে এখানে আসতে ?

—এক ঘণ্টা হবে।

—বাড়ীর কোন চিহ্ন মনে পড়ে ?

—চিহ্ন ?

একটু ভেবে নিয়ে বৃদ্ধা বললেন :

—হ্যাঁ মনে পড়েছে। বাড়ীর এককোণে কলাগাছ আর একটা বড় গাছে হনুমান আছে, গাছটা বাড়ীর কাছেই।

সন্ন্যাসী এই নিশানা পেয়ে হাসবেন কি কাঁদবেন ঠিক বুঝে উঠতে পারলেন না। কিন্তু আশ্চর্য হলেন না বৃদ্ধার উত্তর শুনে। এরকম প্রশ্নের জবাবে তাঁদের প্রায়ই এ ধরনের উত্তর শুনতে হয়। এবং এর উপর নির্ভর করেই খুঁজে বার করতে হয় হারানো যাত্রীদের আস্তানা। তবুও চিন্তিত হয়ে পড়লেন সন্ন্যাসী।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে। অকথ্য ভিড়, তাড়াতাড়ি পা চালাবার উপায় নেই! কখন ঝড় বৃষ্টি আসে কে জানে! দায়িত্বটা

যখন এসেই পড়েছে তখন পালন করতেই হবে! অগত্যা একটি আলো যোগাড় করে নিয়ে সন্ন্যাসী বেরিয়ে পড়লেন অজানা পাণ্ডার বাড়ীর উদ্দেশ্যে। অসহায় নিমজ্জমান ব্যক্তি যেমন ভাসমান খড়-কুটোকে আশ্রয় হিসাবে অবলম্বন করার চেষ্টা করে ঠিক তেমনি সন্ন্যাসী বৃদ্ধার নিকট শোনা ওই কদলী বৃক্ষের চিহ্নটির উপর নির্ভর করে রওনা হলেন। কিন্তু হা হতোস্মি! কদলী বৃক্ষ আর হনুমানের কমতি নেই হরিদ্বারে।

কিন্তু সন্ন্যাসীর দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় মিথ্যা হবার নয়। অনেক ঘুরে ফিরে চেষ্টা করে শেষে নির্দিষ্ট পাণ্ডার বাড়ীটা তিনি খুঁজে পেলেন।

বৃদ্ধা পাণ্ডার বাড়ীর ভেতর ঢুকেই সগর্বে বলে উঠলেন:

—কেমন বলেছিলাম না বাড়ীতে কলাগাছ আছে। সগর্বে অঙ্গুলি সংকেতে দেখালেন বৃদ্ধা কলাগাছগুলোকে।

অন্ধকারে সন্ন্যাসীর চোখে কদলীবৃক্ষ পড়ল কিনা ঠিক বোঝা গেল না। তবু মাথা নেড়ে জানালেন বৃদ্ধার কথাই ঠিক।*

—০—

*উপরোক্ত ঘটনাটি ঘটে ১৯২৭ সালে হরিদ্বারের কুম্ভমেলায়।

ধর্মশালা ও জলসত্র

ঘন ঘন দরজায় করাঘাত হতে লাগল। কিন্তু কেউ দরজা খুলল না। প্রচণ্ড শীতের রাত্রি। বাইরে থর থর করে কাঁপছেন সন্ন্যাসীরা। শেষে চেঁচিয়ে ডাকলেন :

—কে আছেন ভেতরে, দরজা খুলুন। দরজা খুলুন। কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা!

আওয়াজটা ব্যর্থ হয়ে ফিরে এল। বাইরের আলোতে চোখে পড়ল বিরাট প্রাসাদোপম বাড়ী। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করা। অথচ কেউ খুলচে না। আশ্চর্য!

একটু জিরিয়ে নিয়ে আবার ডাকলেন সন্ন্যাসী।

—কে আছেন ভেতরে? দয়া করে দরজাটা খুলে দিন। আর পারছিনে দাঁড়িয়ে থাকতে। শীতে হাত পা জমে যাচ্ছে। এবারও সাড়া পাওয়া গেল না। শেষে অনেক ডাকাডাকি চেঁচামেচির পর বেরিয়ে এল একজন লোক।

অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে সন্ন্যাসীদের দিকে তাকিয়ে জিগগেস করল।

—কি চাই? অত সোরগোল করছ কেন?

—এটা কি ধর্মশালা?

—হুঁ।

—একটু আশ্রয় চাই বাবা। বিপদগ্রস্ত সন্ন্যাসী আমরা।

জমাদার মুখব্যাদন করে জবাব দিল :

—না, এখানে হবে না। আগে দেখ।

—কী বলছ? রাতের মত একটু আশ্রয় না পেলে নিমোনিয়া হয়ে যাবে। সারাদিন প্রচারের কাজে ঘুরে ক্লান্ত। একটু আশ্রয় ভিক্ষা চাইছি। আমরা বিদেশী সন্ন্যাসী।

শীতে ঠক ঠক করে কাঁপছেন সন্ন্যাসীগণ। লোকটির মুখ কঠিন হয়ে উঠল।

আবার অনুরোধ জানালেন সন্ন্যাসী :

—বাবা দয়া কর। একটু আশ্রয় দাও। যেমন তেমন একটা ঘর হলেই হবে। প্রায় সব ঘরেই তো তালা দেখছি! সবই খালি।

—না, না, তোমাদের কোন ঘর দেওয়া হবে না। ভাগো এখান থেকে।

কাতর কণ্ঠে বললেন সন্ন্যাসী :

যদি কোন অন্যায় করে থাকি মাফ চেয়ে নিচ্ছি। এই বরবাংকি শহরে আমরা নবাগত। কোন জানা শোনা লোক নেই, বাড়ী নেই। তাই নিরুপায় হয়ে ছুটে এসেছি এই ধর্মশালায়। কথা দিচ্চি কাল সকালেই চলে যাব। বিশ্বাস কর।

শত অনুনয় বিনয়েও জমাদারের মন নরম হল না। মুখের ওপর দরজাটা বন্ধ করে দেবার উপক্রম করল।

সন্ন্যাসী শেষবারের মত অনুরোধ জানালেন :

—বেশ ঘর না হোক কোন রকম একটু ঢাকা বারান্দা বা খুপরি হলেও চলবে।

জমাদার রুক্ষ কণ্ঠে জবাব দিল :

—না, হবে না। এ ধর্মশালা জৈনদের জন্য। বলেই সশব্দে দরজটা বন্ধ করে দিয়ে সে ভেতরে চলে গেল।

সামান্য বস্ত্রে আপাদমস্তক কোন রকমে ঢেকে সন্ন্যাসীরা রওনা হলেন স্টেশনের দিকে। উদ্দেশ্য, ওয়েটিং রুমে ঢুকে কোন রকমে

রাতটা যদি কাটানো যায়! শরীর কাঁপছে, পা দুটো অবাধ্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু উপায় নেই। অতি কষ্টে কাঁপতে কাঁপতে হেঁটে এসে তারা হাজির হলেন স্টেশনে। এসে দেখলেন, ওয়েটিং রুমও বন্ধ। তালা মারা। খুলে দেবার মত স্টেশনে কেউ নেই। অগত্যা প্লাটফর্মের এক প্রান্তে কোন রকমে গুটি-সুটি মেরে পড়ে রইলেন তারা। প্রচণ্ড শীতে তাঁদের দুঃখ কষ্টের অবধি রইল না। কিন্তু এতটুকু হা-হুতাশ করলেন না। ভোর হতেই প্লাটফর্ম ছেড়ে উঠে পড়লেন। বেরিয়ে পড়লেন নিয়মিত প্রচারের কাজে।

আহার নেই, নিদ্রা নেই, বিশ্রাম নেই, চলার ও কাজের শেষ নেই। শীত গ্রীষ্ম নির্বিশেষে।

শীতের রাতের তিক্ত অভিজ্ঞতা ওখানেই সীমাবদ্ধ রইল না। গ্রীষ্মের জন্যও তোলা রইল। প্রচণ্ড গ্রীষ্ম। বিয়াওয়ার শহর।

পথ আগুনে যেন তেতে উঠেছে। মাথা গরম হয়ে উঠেছে, কণ্ঠ-তালু শুকিয়ে উঠেছে। তবু সন্ন্যাসীদের চলার বিরাম নেই। শহরে প্রচার কাজ শেষ করে ফিরছেন সন্ন্যাসীরা।

রেলস্টেশন পৌঁছুতে এখনও অনেকখানি পথ বাকী। মালপত্র গরুর গাড়ীতে চাপিয়ে দিয়ে সন্ন্যাসীরা চলেছেন পায়ে হেঁটে। এদিকে জল পিপাসা বেড়েই চলেছে। কিন্তু কোথায় জল?

আশে পাশে কোন জলের কল, পুকুর বা জলসত্র চোখে পড়ছে না। জিগগেস করলে পথচারীরা সঠিক উত্তর দিচ্ছে না। সবাই ছুটছে ঊর্ধ্বশ্বাসে। কারো দাঁড়াবার উপায় নেই। পথের পাশে কোন গাছ নেই, ছায়া নেই, কোন আশ্রয় নেই। পিপাসায় বুকের ছাতি যেন ফেটে যাচ্ছে।

চলার আর শক্তি যেন নেই। বাক্‌শক্তিও রহিত হয়ে আসছে। জিভ শুকিয়ে যেন কাঠ হয়ে গেছে।

তৃষ্ণার্ত সন্ন্যাসীরা কাতর হয়ে পড়লেন।

আরো কয়েক পা এগিয়ে যেতেই একটি জলসত্র তাঁদের চোখে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে প্রাণটা যেন তাঁরা ফিরে পেলেন!

গরুর গাড়ীর চালককে অপেক্ষা করতে বলে তাঁরা সাগ্রহে এগিয়ে গেলেন জলসত্রের দিকে।

একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। আর চিন্তা নেই। অতি বাঞ্ছিত জল হাতের কাছে এসে গেছে। পেট ভরে জল খেয়ে উদর ও শরীর দুই ঠাণ্ডা করবেন। আর একটু বাড়তি জল পেলে গামছাটা ভিজিয়ে নিয়ে মাথায় দেবেন। যথারীতি জলসত্রে এসে ঘাড় নীচু করে হাত দুটো অঞ্জলি করে বাড়ালেন একজন সন্ন্যাসী। কৈ জল পড়ছে না তো হাতে?

মুখ তুলে কাতর কণ্ঠে বললেন তিনি:

—বড্ড পিপাসা, জল দিন।

লোটাটা সরিয়ে নিয়ে পানি-পাঁড়ে নির্মমভাবে উত্তর দিল:

—না, জল পাবে না। এ জলসত্র শুধু জৈনদের জন্য! বুঝলে?

শত অনুনয় বিনয়েও পানি-পাঁড়ের মন গলল না। গলল না লোটার জল। অথচ এর নাম জলসত্র।*

* ১৯২৯ সাল পৌষমাস। উত্তর প্রদেশের বরবাংকি শহর।
১৯৪৬ সাল গ্রীষ্মকাল। বিয়াওয়ার শহর।

আতিথেয়তা

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। সন্ন্যাসীদ্বয় পা চালিয়ে এসে পৌঁছুলেন চব্বিশ পরগনার হাকিমপুরে।

সুমুখেই এক পরিচিত গৃহস্থের বাড়ী। বাড়ীর কাছে এসে তারা খবর পাঠালেন গৃহস্থকে।

দু'জন সন্ন্যাসী এসেছেন খুলনার আশাশুনি আশ্রম থেকে। খবরটা পেয়ে ছুটে এলেন গৃহস্বামী। খুশী হয়ে বললেন ঃ

—আপনারা রাত্রিটা এখানে থেকে যান কোন অসুবিধে হবে না। অতদূর থেকে এসেছেন। বিশ্রাম করুন। আমি হাত পা ধোবার জল পাঠিয়ে দিচ্ছি। বলেই ভেতর বাড়ীতে ফিরে গেলেন গৃহকর্তা।

খানিকক্ষণ পর বদনা করে জল পাঠিয়ে দিলেন আর বসার জন্য আসন।

সন্ন্যাসীদ্বয় হাত মুখ ধুয়ে নিয়ে কতকটা সুস্থির হলেন। চ'লে গেলেন রাত্রি বাসের জন্য পার্শ্বস্থ একটি খালি বাড়ীতে।

গৃহকর্তা এলেন আবার একটা অনুরোধ জানাতে।

—স্বামিজীরা, আপনারা রাত্রে এখানেই আহার করুন। বাসন-পত্র ও তৈজসপত্র সবই মজুত আছে। সিধে দিচ্ছি। তা ছাড়া পূজার সরঞ্জামও রয়েছে, কাঁসর, ঘণ্টা, বাসন-কোষণ ইত্যাদি। ওগুলো এখনও অব্যবহৃত রয়েছে, বিসর্জন দেওয়া হয়নি। যদিও এ পূজা-আচ্চার রেওয়াজ উঠে গেছে অনেকদিন। বিশ্বাস করুন সবই শুদ্ধ জিনিস। কোন অপবিত্র জিনিসের ছোঁয়াচ লাগেনি।

সন্ন্যাসীদ্বয় ভাল করেই জানেন গৃহস্বামীকে। গৃহস্বামীও চাঁদা ও সাহায্য দিয়ে সঙ্ঘের কাজে সহায়তা করেন। খুলনার ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সময় প্রত্যক্ষ করেছেন গৃহকর্তা সঙ্ঘের সেবাকার্য। তাই তিনি সঙ্ঘের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, তবুও একটা কিন্তু থেকে যায় সন্ন্যাসীদের মনে। তারা চুপ করে থাকেন। আবার অনুমতি চান গৃহস্বামী।

—তা হ'লে সিধে পাঠাই। আপনারা নিজেরাই পাক করে নিন।

উত্তরে একজন সন্ন্যাসী বলেন :

—না, ব্যস্ত হবেন না। আমরা দুপুরের আহার শেষ করেই এসেছি।

—সেই দুপুরে খেয়েছেন। এখন দুপুর বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে নেমেছে। অত বড় রাত্রি না খেয়ে থাকা ঠিক নয়। তা ছাড়া এতে গৃহস্থের অকল্যাণ হবে।

দ্বিতীয় সন্ন্যাসী বললেন :

—রাত্রিতে আশ্রয় পেয়েছি এই যথেষ্ট।

কি একটু ভেবে নিয়ে গৃহকর্তা বললেন :

—মা বলছেন, অনুমতি দিলে তিনি নিজের হাতে শুদ্ধ ভাবে রান্না করে দেবেন। নিরামিষ রান্নায় তিনি সিদ্ধহস্ত। তিনি নিষ্ঠাবতী বিধবা। যদিও এখন তিনি·········

কিন্তু সন্ন্যাসীরা নীরব। উদ্দেশ্য, উপোস থেকে রাত কাটাবেন তবুও এ বাড়ীর রান্না খাবেন না। কিছুতেই নয়। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তাঁরা। কিন্তু একথা আশ্রয়দাতার মুখের উপর বলা যায় না।

গৃহস্বামী সচেতন, খুঁতটা কোথায়! তবুও তিনি আগ্রহ দেখান। বিধবা মা'র দোহাই পাড়েন।

—আমার মা বলছেন, ফকির, সাধু বাড়ীতে এসে অভুক্ত থাকলে গৃহস্থের পাপ হয়।

উত্তরে দ্বিতীয় সন্ন্যাসী রসিকতা করে একটা খোঁচা দেন :

—আপনি তো এত সমাদর করছেন, কিন্তু আপনার পত্রিকা আমাদের উপর খড়গহস্ত, যা তা লেখেন আমাদের বিরুদ্ধে।

—তাই নাকি ? বলেই গৃহস্বামী সশব্দে হেসে ওঠেন। হাসির বেগ কমলে বলেন :

—কাগজয়ালাদের কথা ছেড়ে দিন। ওরা কখনও বাড়িয়ে, কখনও কমিয়ে লেখেন। ওই ওদের পেশা, নইলে কাগজ চলবে কী করে ? যাকগে এজন্য গোসা করবেন না।

সন্ন্যাসীদ্বয় হেসে ফেলেন গৃহস্বামীর উত্তর শুনে। তারপর কি একটু ভেবে নিয়ে বলেন।

—আপনি ব্যস্ত হবেন না। রাত্রে আমরা হাল্কা খাবার খাই। পর্যাপ্ত শুকনো খাবার সঙ্গে রয়েছে। ওতেই চলে যাবে।

কতকটা নিশ্চিন্ত হলেন গৃহস্বামী। আর যাই হোক অভুক্ত থাকবেন না স্বামিজীরা। মা গোসা হবেন না, আর পরিবারের অমঙ্গলও হবে না। বাঁচা গেল। কিন্তু কে জানত, এই গৃহস্বামীই একদিন কালাপাহাড় হবেন !*

* গৃহস্বামী—আজাদ ও মোহাম্মদী পত্রিকার সম্পাদক - মৌলানা আক্রম খাঁ। পূর্বপুরুষ ব্রাহ্মণ। মা—প্রাক্তন ব্রাহ্মণ ঘরের বিধবা। সন্ন্যাসী—হরিহরানন্দ ও অন্য একজন।

অগ্নিশাসন

ধর্মার্থীদের বহু আকাঙ্খিত মেলা।

হরিদ্বারের কুম্ভমেলা। লোকে লোকারণ্য। নানা জায়গা থেকে এসেছেন ধর্মার্থীরা। নারী পুরুষ নির্বিশেষে। সাময়িক আস্তানার জন্যে গড়ে উঠেছে খড়ের ছাউনি, তাঁবু, বাঁশ ও টিনের ঘর, ডেরা। তা'ছাড়া অন্যান্য ধরনের কাঁচা-পাকা যাত্রীশালা! যে যেখানে পাচ্ছে মাথা গুঁজবার চেষ্টা করছে। তার উপর বসেছে মেলা, বাজার। সোয়া মাইল লম্বা আর আধ মাইল চওড়া রোঢ়ীদ্বীপ জুড়ে। তিল ধারণের জায়গা নেই বলতে গেলে। অধিকন্তু হরিদ্বারের দিকে মুখ করে প্রায় দু' ফার্লং জায়গা জুড়ে গড়ে উঠেছে দোকান, স্কাউট ক্যাম্প, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের যাত্রীশালা, আশ্রম, রামকৃষ্ণ মিশনের তাঁবু ইত্যাদি।

সবাই নিশ্চিন্ত। সঙ্ঘ সন্ন্যাসী, স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী ও স্কাউটরা যাত্রীদের তদারক করছে। যাত্রীরা নির্বিঘ্নে ঘুরেছেন ফিরছেন, কেনা-কাটা করছেন। কেউ বা কিনছেন রান্নার সরঞ্জাম, শবজি; আবার কেউ বা কিনছেন রঙ বেরঙের জিনিস পীঠস্থানের চিহ্ন হিসেবে। বাড়ী গিয়ে প্রিয়জনের হাতে তুলে দেবেন। ছোট ছেলেমেয়েদের মুখে হাসি ফোটাবেন। তা'ছাড়া কতজনের কতরকমের ফরমাশ রয়েছে। যার যার সাধ্যমত তা' মেটাবার চেষ্টা করবেন বৈ কি! ইতস্ততঃ বসে পড়েছেন অনেকেই। কেউ বা একটু ফাঁকা জায়গা পেয়ে রান্না চড়িয়েছেন, আবার কেউ ভীড়ের চাপে বা পথশ্রমে ক্লান্ত

হয়ে মাথায় হাত দিয়ে বিশ্রাম করছেন। সর্বোপরি পীঠস্থানের মাধুর্যে যাত্রীদের মন ভরপুর।

সেদিন কুম্ভস্নান সেরে ফিরছেন যাত্রীরা নিজ নিজ আস্তানায়। তৃপ্তি ও খুশীতে চোখ মুখ তাঁদের অনেকটা সতেজ ও প্রফুল্ল দেখাচ্ছে। ঈশ্বর তাদের মনোবাসনা পূরণ করেছেন। এইবার পরিতৃপ্ত মন নিয়ে বাড়ী ফিরবেন তাঁরা। যাত্রীদের মধ্যে, নারী পুরুষ সকলেরই এখন সেই একই প্রশ্ন। কখন ফিরে যাওয়ার গাড়ী পাওয়া যাবে?

কিন্তু হঠাৎ রোটীদ্বীপে ব্রহ্মকুণ্ডের বিপরীত দিক থেকে আর্ত নর-নারীর চীৎকারে আকাশ বাতাস ভারী হয়ে উঠল।

কি হল? কি হল?

বিরাট কোলাহলের সৃষ্টি হল।

আনন্দময় পরিবেশটা কয়েক মিনিটের মধ্যেই নিরানন্দে পর্যবসিত হল।

ক্রমাগত চীৎকার। কান্না, হা-হুতাশ।

আগুন, আগুন! গেল, গেল, সর্বনাশ! যাত্রীদের কান্নার সঙ্গে সঙ্গে গরম আগুনের হল্কা এসে গায়ে লাগছে মেলার লোকদের।

নারী পুরুষ নির্বিশেষে আশ্রয় শিবিরে ও বাইরে সাহায্যের জন্য চিৎকার করছেন। দেখতে দেখতে আগুনের লেলিহান শিখা তীব্র বাতাসের ঝড়ের চাপে দুরন্ত অশ্বের মত বিদ্যুৎ বেগে ছুটে চলেছে। মুহূর্তের মধ্যে খড়ের ছাউনিগুলো পুড়ে শেষ হয়ে গেল। ধূলিসাৎ হয়ে গেল তাঁবু, দোকান ঘর ইত্যাদি।

যাত্রীরা দেখলেন, আগুনের অভূতপূর্ব তাণ্ডবলীলা। লেলিহান শিখা একটির পর একটি শিবিরকে গ্রাস করে চলেছে। দিশেহারা হয়ে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছেন যাত্রীগণ।

কিন্তু কোথায় যাবেন?

চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে আগুন!

অগ্নিশিখা ছুটে আসছে সঙ্ঘ-শিবিরের দিকে। সঙ্ঘ-সন্তানগণ সন্ত্রস্ত, ভয়বিহ্বল। গুরু মহারাজের আসন বুঝি আর রক্ষা করা যাবে না! আগুনের উড়ন্ত ফুলকি এসে পড়ছে পতঙ্গের মত, আশ্রম সংলগ্ন যাত্রীশালায়। গেল, গেল, বলে চেঁচিয়ে উঠলেন যাত্রীদল ও সঙ্ঘ-সন্তানগণ।

ততক্ষণে স্কাউট ক্যাম্পের কাছে পৌঁছে গেছে আগুন। ছুটোছুটি শুরু হয়েছে আর্তদের!

গুরু মহারাজ বসে আছেন স্বীয় আসনে। বসে বসে হু'পায়ে তাঁর গ্যাংগ্রিন্ হয়েছে। পুরু ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। দিনরাত একইভাবে বসে থেকে থেকে তাঁর পা হুটো ফুলে উঠেছে, অবশ হয়ে গেছে। উঠে দাঁড়াবার মত শক্তি নেই। কিন্তু আর্তের চিৎকার শুনে স্থির থাকতে পারছেন না। এদিকে সঙ্ঘ-সন্তানগণ তাঁর জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন। কিন্তু ঘরে ঢুকে তাঁকে বিরক্ত করতে সাহস পাচ্ছেন না। শেষে নিরুপায় হয়ে এসে তাঁরা দাঁড়ালেন গুরু মহারাজের দোরের কাছে। নিবেদন করলেন গুরুতর পরিস্থিতির কথা। অবস্থাটা আঁচ করতে বিলম্ব হল না আচার্য প্রণবানন্দজী মহারাজের। তিনি সঙ্ঘ-সন্তানদের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে অভয় বাণী জানালেন। ধীরে ধীরে দণ্ডীর উপর ভর করে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর আস্তে আস্তে পা ফেলে এসে দাঁড়ালেন আশ্রমদ্বারে।

ইতিমধ্যে আশ্রমিক ও তীর্থযাত্রীরা বস্তা ও কম্বল ভিজিয়ে আশ্রম শিবিরের চালের উপর ছুঁড়ে ফেলতে শুরু করেছেন। সঙ্ঘ-শিবিরকে অগ্নির গ্রাস থেকে রক্ষা করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন।

হঠাৎ আচার্যদেবের শিব চক্ষু হু'টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মাত্র কয়েক হাত দূরের অগ্নিশিখার দিকে তিনি স্থির অথচ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হানলেন।

মুহূর্তের মধ্যে অগ্নিশিখা যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। গতি তার বদলে গেল। এই অভাবিত ব্যাপার দেখে আনন্দে বিহ্বল হয়ে গেলো উপস্থিত সঙ্ঘ-সন্তান ও যাত্রীদল। খবর শুনে ছুটে এলেন ভক্তগণ। সকলের মুখে একই প্রশ্ন।

কী করে এই অলৌকিক ব্যাপার ঘটল? রোঢ়ীদ্বীপের ভস্মীভূত ছাউনি, ক্যাম্প, দোকান ঘরের মধ্যে শুধু……

বিস্ময়ের বস্তু হয়ে অক্ষত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে শুধু সংঘের আশ্রম-শিবির আর তা'র সংলগ্ন স্কাউট ক্যাম্পটি। আশ্চর্য!

এ কি করে সম্ভবপর হল?

বিস্ময়ে অভিভূত হলেন দর্শকগণ।

এই ঘটনাটা মনে করিয়ে দেয় দ্বাপর যুগের শ্রীকৃষ্ণের দাবানল পানের কথা। অগ্নি দেবতা শ্রীকৃষ্ণের কাছে নতি স্বীকার করে যেমনি তাঁর গতি ও মতি পরিবর্তন করেছিলেন, এযুগের আচার্যদেবের কাছেও ঠিক তাই করলেন।*

* শ্রীমৎ স্বামী বেদানন্দজীর মুখে শোনা। ১৯৩৮ সাল চৈত্র মাস।

আমাগো মহারাজ

বৃদ্ধা এলাহাবাদ স্টেশনে নেমেই একজন স্বেচ্ছাসেবককে বললেন :

—বোঝলা বাবা, আমি যামু আমাগো মোহারাজের আশ্রমে, কোন পথে যামু কইয়্যা দাও।

স্বেচ্ছাসেবক হিন্দীভাষী। বৃদ্ধার কথা তার বোধগম্য হল না। বহু রকমের বহু প্রশ্ন আঞ্চলিক ভাষায় করে সেই একই রকম জবাব পেল সে। শেষে বিরক্ত হয়ে শেষ প্রশ্ন করল :

—মাতাজী, কোন মহারাজকা পাশ যাওগী? মকানকা নাম মালুম হ্যায়?

বৃদ্ধা বিরক্ত হয়ে বললেন :

—যাওগে কী, যায়গা, আশ্রম, আমাগো মোহারাজের আশ্রম, একনামে সবাই চিনে, বাংলাদেশের ব্রহ্মচারী, এখানে আশ্রম আছে, নাম করা মহারাজ, বুঝলা?

স্বেচ্ছাসেবক মনে মনে স্থির করলেন বৃদ্ধাকে মিসিং স্কোয়াডের তালিকাভুক্ত করবেন। পরে অবস্থা বিশেষে ব্যবস্থা করা যাবে।

বৃদ্ধা বুঝে নিলেন, যুবকটি কিচ্ছু খবর রাখে না। তা'ছাড়া কাণেও বোধ হয় কম শোনে। নিজেই বলল, ম-কাণমে। কাণের মধ্যে বোধ হয় ময়লা ভর্তি। তবুও শেষ চেষ্টা করলেন।

—বুঝলা, হেলা-ফেলা নয়, আশ্রমে দালান-কোডা আছে, অনেক সন্ন্যাসী আছে। খুব ডাক নাম।

বেশ চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বললেন তিনি। ভাষা না জানলে, না

বুঝলে, চেঁচিয়ে বললেই বা কী হবে! অথচ শুধু একটি নাম বললেই সমস্যা সমাধান হয়ে যেত। শুধু স্বামিজী মহারাজের সঠিক নাম। স্বেচ্ছাসেবকটির বিরক্তির মাত্রাও বেড়ে গিয়েছিল। কোন উপায়ান্তর না দেখে স্থির করলেন, কোন বাঙালী স্বেচ্ছাসেবক বা সন্ন্যাসীকে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করবেন।

বৃদ্ধা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে স্বেচ্ছাসেবকের মুখের দিকে তাকিয়ে ভ্রূ কুঁচকালেন। ভলাণ্টিয়ারের অযোগ্যতা অসহ্য।

—তোমার মুরদ বুঝছি। আমাগো বাংলাদেশের মোহারাজকে চেন না, আবার বলাণ্টিয়ার হইছ। পোড়াকপাল, আবার কথাও বুঝ না। তেনারে না চিনে এমন লোক আমাগো দেশে নাই, এক নামে হিন্দু মুছলমান বেবাকে চেনে। যারা কাগজ পড়ে তারাও জানে। একবার ইয়া বড় ছবি—বাইর হইছিল। বুঝলা মানিক, তেনি রামা-শ্যামা নয়। তা'র ডরে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়। তুনিয়ার লোক পায়ের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে, বুঝলা?

কি বুঝল স্বেচ্ছাসেবক সেই জানে।

প্রকাশ্যে বলল, চলিয়ে মেরা সাথ। ঢুঁরনে জরুর কৌশিশ করুঙ্গা।

বৃদ্ধা বিরক্ত হয়ে স্বগতঃ বললেন ঃ

—মেড়াটা আবার কয় কি? ঢুঁ মারবে নাকি?

বৃদ্ধার গভীর বিশ্বাস, মহারাজকে পাওয়া যাবেই। আর মহারাজকে দর্শন না করে প্রয়াগে চান না করে তিনি বাড়ী ফিরবেন না। এ তার প্রতিজ্ঞা।

অগত্যা স্বেচ্ছাসেবককে ছেড়ে দিয়ে বৃদ্ধা একাই স্টেশন থেকে বেরিয়ে পথে নামলেন। একে-তাকে জিগ্‌গেস করে করে পথ চলতে লাগলেন। তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, মহারাজকে খুঁজে বার করবেনই,

নইলে জলগ্রহণ করবেন না। অত বড় মহারাজকে খুঁজে পাওয়া যাবে না, এ কথা তিনি প্রাণ থাকতে বিশ্বাস করেন না। তাঁরই কথা চিন্তা করতে করতে তিনি অতদূরের রাস্তা এসেছেন। একবার দর্শন পেলেই আর কথা নেই। প্রয়াগে চান, পূজা সব নির্বিঘ্নে হয়ে যাবে।

গাঁটরিটা এক একবার এ-কাঁখ থেকে আবার ও-কাঁখে করছেন। পথচারীদের নির্দেশে বহুবার ভুল পথে ছুটে দেহ তার ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। মাথা ঘুরছে। দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে এসেছে। তবুও পথ চলছেন মন্থর গতিতে।

কোথায় মোহারাজ? দেখা দেও, আর পারি না!

কাতরভাবে আবেদন জানান বৃদ্ধা। কখনও প্রকাশ্যে কখনও বা মনে মনে। কিন্তু পথ চলা তার বন্ধ হয় না। খুটখুট করে এলাহাবাদের কাঁচা পাকা সব রাস্তা অতিক্রম করেন। শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধার আত্মপ্রত্যয়েরই জয় হল। তিনি খুঁজে খুঁজে সন্ধ্যার দিকে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে এসে হাজির হলেন। পা দুটো তখন তার কাঁপছে। কণ্ঠস্বরও প্রায় বুঁজে এসেছে। চোখ দুটো কোটরে ঢুকে আরো ছোট দেখাচ্ছে। কিন্তু তবু তার আনন্দ ধরে না। আশ্রমের ঘরে ঢুকে আচার্যদেবকে দেখেই সোল্লাসে তিনি চেঁচিয়ে ওঠেন।

—এই তো আমাগো মোহারাজ।

———

সঙ্কল্প

ঘুরতে ঘুরতে রাত্রি ঘনিয়ে এল। সুমুখে ভয়াবহ বিরাট গুজরাটের প্রান্তর। কলোল থেকে আটদশ মাইল দূর। প্রান্তরের আশে পাশে লোক নেই বললেই হয়।

কে যাবে অন্ধকারে বিপদসঙ্কুল প্রান্তরের কাছে?

ওখানে রাত্রে যাওয়া মানে প্রাণ হারানো। এ কথা স্থানীয় লোকেরা জানে। সন্ন্যাসীকে প্রান্তরের কাছাকাছি দেখে স্থানীয় লোকগণ সাবধান করে দিল।

মহারাজ, সুমুখে ভীতিপূর্ণ বিপদসঙ্কুল পথ। ওদিকে এগোবেন না। প্রান্তরে বিষাক্ত কাঁটা গাছ। পা কেটে যাবে, ঘা হবে। তা'ছাড়া লাগোয়া জঙ্গলে হিংস্র সাপ ও বাঘের উৎপাত। বিশেষ করে এই অন্ধকার রাত্রে পথ খুঁজে পাবেন না। হাতে আলো নেই, সঙ্গে লোক নেই। এই অসম সাহস করবেন না। অযথা অমূল্য প্রাণটি হারাবেন না।

উত্তরে সন্ন্যাসী নীরব হাসি হাসলেন। আত্মপ্রত্যয়ের হাসি। দণ্ডী দৃঢ় হাতে ধরে তিনি বললেন ঃ

—মাভৈঃ।

বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকাল তারা সন্ন্যাসীর মুখের দিকে।

নিশ্চয়ই কোন খেয়ালী মাথাখারাপ সন্ন্যাসী! নইলে এমন উদ্ভট খেয়াল কারো মাথায় চাপে! হাতে কোন অস্ত্র নেই, পায়ে জুতো পর্যন্ত নেই। অথচ যেতে হবে বিরাট কণ্টকময় প্রান্তর

পেরিয়ে। ঘুটঘুটে অন্ধকারে তিন হাত দূরের জিনিস পর্যন্ত দেখা যায় না।

একজন বিরক্ত হয়ে বললেন :

—মরুক গে। বাঘের পেটে যেতে চাইছে যাক।

অন্য একজন এগিয়ে এসে আন্তরিক অনুরোধ জানালেন :

—সাধু বাবা, আসুন, আমার বাড়ীতে আজ রাতটা বিশ্রাম করুন। ভোর হলেই আমি সঙ্গে একজন লোক দেব। সে আপনাকে গন্তব্য স্থানে পৌঁছে দেবে। আমাদের চোখের সুমুখে এমন ভাবে বিপদের ঝুঁকি নেবেন না। আমাদের নিমিত্তের ভাগী করবেন না।

সন্ন্যাসী আশ্বাস দিলেন :

—কিছু ভাববেন না। যিনি পারাপারের মালিক তিনিই পার করাবেন। তাঁর নাম করে বেরিয়েছি। তা'ছাড়া আজ রাতের মধ্যে আমাকে ওপারে পৌঁছুতেই হবে। পৃথিবী রসাতলে গেলেও আমার কার্যসূচীর ব্যতিক্রম হওয়ার উপায় নেই। বলেই সন্ন্যাসী দণ্ডী দৃঢ় হাতে ধরে সুমুখের দিকে পা বাড়ালেন।

মিনতিভরা দৃষ্টিতে তাকাল পল্লীবাসীরা। সন্ন্যাসী আবার স্মিতহাস্যে বললেন :

—এর মধ্যে কোন কিন্তু নেই। আমাদের চারণদল কাল ভোরেই কলোল ছেড়ে চলে যাবে। কাজেই আজ রাতের মধ্যেই গিয়ে মিলতে হবে তাদের সঙ্গে। আমার সময় নষ্ট করার উপায় নেই। ছুটি দিন। গুরু মহারাজের কৃপা হলে আবার দেখা হবে। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। গুরু মহারাজ আপনাদের মঙ্গল করুন।

স্বগত বললেন একজন গৃহস্থ :

—না, পাগলের প্রলাপ তো এ নয়। নিশ্চয়ই উঁচু দরের একজন সাধু।

অন্য একজন বললেন বিদ্রূপ করে :

—উঁচু দরের পাগল। নইলে এমন খামখেয়ালী কেউ হয়?

কিন্তু কেউ আর বাধা দিল না। নীরবে দাঁড়িয়ে দেখল সন্ন্যাসীর কাণ্ডটা।

হন হন করে সন্ন্যাসী গিয়ে ঢুকলেন প্রান্তরের মধ্যে।

উপস্থিত লোকদের বুকের ভেতরটা আশংকায় দুরু দুরু করে উঠল। তারা নিশ্চিত ধরে নিলেন, কয়েক পা এগুলেই সন্ন্যাসী ক্ষত বিক্ষত হবেন এবং বাঘের পেটে যাবেন। ডাকাতরা পর্যন্ত ওখানে রাত্রে যেতে সাহস করে না।

গুরু মহারাজের নাম স্মরণ করে প্রায় ছুটে চললেন সন্ন্যাসী। কাঁটা গাছে লেগে হাত পা ক্ষত বিক্ষত হচ্ছে কিন্তু এতটুকু ভ্রুক্ষেপ নেই তাঁর। দুস্তর প্রান্তর অতিক্রমণে দৃঢ়সংকল্প সন্ন্যাসী। বিরামবিহীন দৃঢ় অথচ ক্ষিপ্র পদে চলেছেন তিনি। ঘন ঘন আওড়ে চলেছেন, গুরু কৃপাহি কেবলম্।

এদিকে কলোলের চারণদলের সন্ন্যাসীরা চিন্তিত হয়ে পড়েছেন।

কৈ, স্বামিজী এখনও এলেন না তো! অপরিচিত জায়গায়, কোথায় কোন বিপদে পড়েছেন কে জানে! প্রচারে পদে পদে বিপদ, অপমান লাঞ্ছনার সম্মুখীন হতে হয়। আবার কখনও কখনও ব্যতিক্রমও দেখা যায়। গৃহস্থ ভক্তগণ সন্ন্যাসীকে পেলে আপ্রাণ সেবা যত্ন করেন। ছাড়তে চান না।

তবে কি?

না, স্বামিজীকে তাঁরা ভাল করে জানেন। তিনি কঠোর কর্ত্তব্য-পরায়ণ। উপরোধ অনুরোধে তিনি কর্ম্মসূচী বাতিল করবেন না। নিশ্চয়ই ফিরবেন।

এদিকে ঝড় উঠছে।

যদি আশ্রয়হীন হয়ে পড়েন!

আশংকিত হলেও তারা মনোবল হারান না। মাথার উপর গুরু মহারাজ রয়েছেন। দেখতে দেখতে অনেক রাত হয়ে গেল! কাল ভোরেই অন্যত্র রওনা হতে হবে। স্বামিজী না এসে পৌঁছুলে··· হঠাৎ এক কম্পিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল। দোর খুলুন।

ব্যস্ত হয়ে উঠে গিয়ে শিবানন্দজী দোর খুলে দিলেন। হাতের বাতিটা উঁচু করে তুলে ধরে দেখলেন।

স্বামিজীর দেহের কোন কোন স্থান থেকে রক্তপাত হচ্ছে। কিন্তু মুখে মিষ্টি হাসি।

এ কি কাণ্ড!

ব্যস্ত সমস্ত হয়ে উঠে স্বামিজীকে ঘরে নিয়ে এলেন শিবানন্দজী।

জামাকাপড় খুলতে খুলতে বললেন স্বামিজী :

—ও কিছু নয়। প্রান্তরের উপর দিয়ে আসতে গিয়ে একটু কাঁটার খোঁচা লেগেছে।

—প্রান্তর পার হয়ে এসেছেন?

—হ্যাঁ, ঐ তো একমাত্র পথ!

—বলেন কি? ওখানে বাঘ সাপ ভর্তি, তা'ছাড়া······

সহাস্যে বললেন স্বামিজী :

—ভোরেই তো আবার বেরিয়ে পড়তে হবে। ভোরের আলো ফুটে উঠছে। নিন, গুছিয়ে নিন।

কোথায় ক্লান্তি, কোথায় বিশ্রাম!

স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দজী এখনও পিচগলা রাস্তায় খালি পায়ে চলেন। জুতা কখনো ব্যবহার করেন না।

কড়া-পাহারা

গন্তব্য স্থান গয়াধাম। সঙ্গে রয়েছেন সঙ্ঘগুরু আচার্যদেব নিজে।

দল বড়, জিনিসপত্রও সেই অনুসারে প্রচুর রয়েছে। হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে স্তূপীকৃত হয়ে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয় জিনিস। তার উপর রয়েছে সঙ্ঘ-সন্তানগণের ব্যক্তিগত বিছানাপত্র ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি। পূজার সরঞ্জাম, বাসন কোসন, প্রসাদ বিতরণের জন্য বালতি, হাতা। রান্নার বিরাট বিরাট কড়াই ও খুন্তি। অধিকন্তু রয়েছে মণ্ডপের সামিয়ানা, শতরঞ্চি, দড়াদড়ি ও অন্যান্য উপকরণ।

পাহাড় সদৃশ জিনিসের স্তূপটির দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে যায় অন্যান্য যাত্রীগণ। এই স্তূপীকৃত জিনিসের মাঝখানে গুরুগম্ভীর বিশালদেহী মহাদেব সদৃশ আচার্যদেব বসে আছেন দণ্ডী হাতে। সঙ্ঘ সন্তানগণ তাঁর নির্দেশ মত কাজ করছেন। তারা সবাই যেন মিলিটারি সৈনিক। হুকুমের সঙ্গে সঙ্গে তালিম করছেন।

সবাই যার যার নির্দিষ্ট স্থানে কর্তব্যরত। কেউ কেউ এটেনশন্ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। যেন দুষ্টু ছেলের নড়ন-চড়ন বারণ। আশ্চর্য রকম নিয়মানুবর্তিতা। যাত্রীরা দেখেন আর অবাক হন। এ-যুগে কী করে এমন সুষ্ঠু অথচ নীরবে লোক কাজ করে!

বিরাট বিরাট কড়াই পাহারা দিচ্ছেন একজন সন্ন্যাসী। অদূরে একজন সন্ন্যাসী তাঁকে চাপা কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন।

—কি করছেন স্বামিজী?

সুরসিক সন্ন্যাসী জবাব দিলেন ঃ

—কড়া পাহারা দিচ্ছি।

উত্তরটি আস্তে দিলেও কাছাকাছি সকলেরই কানে গেল। বিশেষ করে উপবিষ্ট গুরু মহারাজের। তিনিও সন্ন্যাসীর সরল নির্দোষ সরস উত্তর শুনে হেসে উঠলেন। সন্তানের নির্দোষ রসিকতায় গুরুগম্ভীর কড়া রাসভারী পিতার মুখেও হাসি ফোটে।

প্রহরারত স্বামী সদানন্দজী দ্ব্যর্থপূর্ণ উত্তরটা দিয়েছিলেন

রাখে গুরু মারে কে?

দার্জিলিং শহর। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আধার। বহু দেশ থেকে লোক আসে. এই সৌন্দর্য উপভোগের জন্য। অর্থবানেরা সম্পূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করে। গরীব মজুররা প্রচণ্ড কায়িক পরিশ্রম করে অন্ন সংস্থানের চেষ্টা করে।

আর সন্ন্যাসীরা?

ওই অচেনা শহরে আসেন দু'জন সন্ন্যাসী—সঙ্ঘের প্রচার কাজের জন্য। প্রচণ্ড শীতে, অতি সামান্য পোশাকে, তারা প্রচারের কাজে ঘুরে বেড়ান। আহার ও বাসস্থান নেই। কিন্তু কাজে এতটুকু শিথিলতা নেই। ক্রমাগত হেঁটে চলেছেন দার্জিলিং-এর উঁচু নীচু পথ—চরাই উতরাই ভেঙ্গে। এতটুকু বিশ্রাম নেই।

সেদিন ভোরে স্বামিজীদ্বয় ঘুরতে ঘুরতে এলেন শহরের প্রাণ-কেন্দ্র, ম্যাল রোডে। খানিকটা এগিয়ে তারা রেস কোর্সের পথ ধরে চললেন দৃঢ় পদক্ষেপে ঢালু পথ ধরে। ঝোপ জঙ্গল পাহাড় কন্দর সব অগ্রাহ্য করে! অজানা অচেনা পাহাড়িয়া পথে। নীরব নিস্তব্ধ পথ। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া। সুমুখে চলেছে ঘোড়ায় চড়ে চারজন যুবক। অতি ধীরে ধীরে। চলতে চলতে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল ঘোড়াগুলো। সোয়ারীর শত তাগিদে এবং ঘন ঘন চাবুকেও ঘোড়াগুলো এতটুকু এগোল না। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। বিরক্ত হয়ে ঘোড়সওয়ারগণ নেমে পড়লেন। সওয়ারদের কাছ থেকে মুক্তি পেয়ে ঘোড়াগুলো ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাল ম্যালের দিকে।

কাণ্ডটা দেখে সবাই অবাক হয়ে গেলেন, পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকালেন।

সকলেরই চোখে মুখে একই প্রশ্ন।

ব্যাপারটা কী? ঘোড়াগুলো অমন করে পালাল কেন?

ততক্ষণে সন্ন্যাসীদ্বয় যুবকদের আরো কাছে এসে গেলেন। দশ হাতের বেশী দূরত্ব হবে না। যুবকদের পোশাক-আচরণ ও কথাবার্তায় স্পষ্ট বোঝা গেল যে তারা বাঙ্গালী। শিকার করার উদ্দেশ্যে এসেছেন তারা। কাঁধে তাদের বন্দুক ঝোলানো। মুখে আত্মপ্রত্যয়।

আরো কয়েক পা এগোতেই ব্যাপারটা পরিষ্কার বোঝা গেল। ঘোড়াগুলো কেন ছুটে পালাল। দলপতি যুবকটি হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন। চারজনের মুখের কথা সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল। চোখে পড়ল অদূরে একটা গাছের নীচে ঝোপের পাশে একটি বিরাটকায় বাঘ শুয়ে আছে। হঠাৎ মানুষের গন্ধ পেয়ে সে উঠে বসেছে। সুমুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে! কী ভয়ঙ্কর রক্তলোলুপ দৃষ্টি!

কিন্তু এই বিপদের মুখে দাঁড়িয়েও সন্ন্যাসীদের মনোবল অক্ষুণ্ণ ছিল! সর্বক্ষণ তাঁরা মনে মনে আওড়েছেন, "গুরু কৃপাহি কেবলম্!" গুরু মহারাজ যাদের সঙ্গে রয়েছেন, তাঁদের আবার ভয় কি! এ বিশ্বাস তাঁদের মনে বদ্ধমূল।

দলপতি যুবকটি এতটুকু ঘাবড়ালেন না! তিনি তাঁর হাতের বন্দুকটি বজ্রমুষ্টিতে ধরে তৎপরতার সঙ্গে পর পর কয়েকটি গুলি ছুঁড়লেন! অব্যর্থ তাঁর লক্ষ্য! আহত বাঘটি অসহ্য যন্ত্রণায় ঘন ঘন বিকট গর্জন করতে লাগল! শেষে কাতর হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল!

দলপতির পেছনের যুবক তিনজন আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল।

সাবাস, সাবাস!

বাঘের মুখ থেকে বেঁচে গেলেন সন্ন্যাসীরা। অভাবিতভাবে যুবক-দলটি সুমুখে এসে দেখা দিলেন! নইলে?*

* আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী বিকাশানন্দজীর নেতৃত্বে প্রচার দল দার্জিলিং গিয়েছিলেন এবং উক্ত ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিলেন।

পিপাসা

আশাশুনি অঞ্চলে বুধহাটা গ্রাম। প্রাথমিক বিদ্যালয়। ক্লাস চলছে। হঠাৎ একটি ছোট্ট ছেলে উঠে দাঁড়াল।

—মাস্টার মশায়, জল তেষ্টা পেয়েছে। জল খেতে যাব।

সঙ্গে সঙ্গে আর একটি ছোট্ট ছেলেও উঠে দাঁড়াল। বায়না ধরল :

—আমিও জল খেতে যাব। ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে।

না হেসে থাকতে পারলেন না শিক্ষক।

—তোদের দু'জনের একই সঙ্গে তেষ্টা পেল কী করে?

উত্তরটি শিশুদের মুখে জোগাল না। শুধু একজন আর এক-জনের মুখের দিকে নীরব দৃষ্টিতে তাকাল।

প্রত্যেকটি ছাত্রকেই শিক্ষক চেনেন। জানেন তাদের নাম ধাম সব। একটু ভেবে নিয়ে বললেন, তোদের দু'জনের বাড়ী স্কুলের কাছেই। ছুটে গিয়ে জল খেয়ে চলে আয়। বেশী দেরী করিসনে যেন।

তক্ষুনি কিন্তু ছুটে বেরিয়ে গেল না তারা। প্রথম ছেলেটি আমতা আমতা করে বলল :

—বাড়ী যাব না, আশ্রমে জল খেতে যাব।

অভিনব প্রস্তাবটা শুনে শিক্ষক চোখ দুটো কপালে তুলে জিজ্ঞাসা করলেন :

—আশ্রমে যাবি কেন? আশ্রমের চাইতে তো বাড়ী কাছে। বাড়ীর জলে কি তেষ্টা মেটে না?

এ প্রশ্নেরও উত্তর পাওয়া গেল না। শিশুদ্বয়ের চোখ শুধু মিনতি ভরা। কি একটু ভেবে নিয়ে শিক্ষক বললেন :

—আচ্ছা, তাই যা। কিন্তু দেরী করিসনে যেন। যাবি আর আসবি।

বাছুরের মত লাফাতে লাফাতে ছেলে দুটি বেরিয়ে গেল।

আশ্রমের জনৈক ব্রহ্মচারী তখন শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলছিলেন। কথা শেষ করেই তিনি আশ্রমের দিকে পা বাড়ালেন। মনে পড়ল তার শিশু দুটির আব্দারের কথা। আশ্রমের জল খেতে যাওয়ার কথা।

কিন্তু কোথায় গেল তারা? চারদিক তাকাতে তাকাতে চলেছেন। আশ্রমে এসেও তাদের হদিস পাওয়া গেল না।

যাক্‌গে, শিশুর খেয়াল। বলে এক, করে আর। হয়ত কোথাও গাছের নীচে খেলা করছে, নয়ত পেয়ারা গাছে চড়েছে। জলতেষ্টা একটা বাহানা মাত্র।

হঠাৎ মন্দিরে কাঁসর ঘণ্টা বেজে উঠল। ঢং ঢং ঢং।

ব্যাপার কী? এ অসময়ে! এখন তো পূজা আরতি বা ভোগের সময় নয়। তবে কাঁসর ঘণ্টা বাজে কেন? শূন্য আশ্রমে কে বাজায়?

ব্রহ্মচারী ক্ষিপ্রপদে এগিয়ে গেলেন মন্দিরের দিকে। মন্দিরে ঢুকেই তাঁর চক্ষু দুটি ছানাবড়া। এই তো সেই পিপাসার্ত ছেলে দুটি। পা টিপে টিপে নিঃশব্দে এসে দাঁড়ালেন তাদের পেছনে।

ব্রহ্মচারী দেখলেন একটি সুন্দর দৃশ্য। একটি ছেলে কাঁসর বাজাচ্ছে, আর একটি মিশ্রীর কৌটা খুলে দু টুকরো মিশ্রী বার করে ছোট রেকাবীর উপর রেখে ঠাকুরের ভোগ চড়াল। তারপর ঘণ্টাটি নিয়ে বাজাতে শুরু করল।

অবশ্য সংক্ষিপ্ত ভাবে পূজোটা সারল তারা। পূজো শেষ করে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই একটা ছায়া তাদের চোখে পড়ল। পেছন

দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকাতেই চোখে পড়ল ব্রহ্মচারী মহারাজকে। ভয়ে আশঙ্কায় তাদের মুখ নীল হয়ে উঠল। কেমন যেন হকচকিয়ে গেল তারা, এ রকমটা যে ঘটবে তা কল্পনাও করতে পারে নি তারা। অসহায় অথচ অপরাধীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ব্রহ্মচারীর মুখের দিকে। আর মনে মনে শাস্তির পরিমাণটা হিসেব করে ভয়ে কেঁপে উঠতে লাগল।

ব্রহ্মচারী সহাস্তে বললেন, এই বুঝি তোদের আশ্রমে জল খেতে আসা? তারপর এগিয়ে গিয়ে হু'জনের হাতে হু'টুকরো মিশ্রী দিয়ে বললেন, প্রসাদটুকু নিয়ে জল খেয়ে স্কুলে ফিরে যা।

অভাবিত ভাবে ঈপ্সিত বস্তু হাতে পেয়ে খুশীই হল তারা। তক্ষুনি মুখে পুরে ছুটে পালাল স্কুলের উদ্দেশ্যে।

ব্রহ্মচারী একদৃষ্টে তৃপ্ত নয়নে তাকিয়ে রইলেন শিশু হুটির অপস্রিয়মান ছোট্ট দেহ হুটির দিকে। আনন্দে মন ভরে উঠল এ কথা ভেবে যে, এতটুকু ছেলেরাও জানে ঠাকুরকে নিবেদন না করে খেতে নেই।

ব্রহ্মচারীর মনে হল ননীচোর গোপালের কথা। ভাবতে ভাবতে কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন তিনি।

শিশু হুটির জল তেষ্টা মেটাবার পদ্ধতি বিচিত্র হলেও সংযত, সুন্দর ও অনুপম। ভাবতে ভাবতে ব্রহ্মচারীর চোখে জল দেখা দিল। নিশ্চয়ই আনন্দাশ্রু।

—

কান্না

চকপিয়ুর পোষ্ট মাষ্টার রজনী মজুমদার।

খবর পেয়েই সকালে স্বামীজীর কাছে ছুটে এলেন।

—শুনলাম প্রচার কাজে এই বর্মা মুলুকে আপনারা এসেছেন। এসেই যখন পড়েছেন, তখন দরিদ্রের গৃহে একদিন পদার্পন করতেই হবে। আমি কোন কথা শুনব না।

স্বামীজী বললেন ঃ

—বেশ তো দেশে ফিরে যাবার আগে একদিন আমরা যাব। এখন প্রোগ্রাম মত কাজ করতে হবে। তাই খুব ব্যস্ত থাকব।

—না, না, আজই আসুন। শুভস্য শীঘ্রম। আমার আপিস বন্ধ।

চোখে মুখে তার তীব্র আগ্রহ ফুটে ওঠল। কী একটু ভেবে নিয়ে বললেন স্বামীজী ঃ

—বেশ আপনার ইচ্ছাই পূরণ হোক। আমরা যাচ্ছি। কিন্তু বেশীক্ষণ আটকে রাখবেন না। হাতে অনেক কাজ।

খুশী হলেন রজনী বাবু।

তাই হবে। চলুন।

নীচে ডাকখানা, উপরে রজনীবাবুর বাসা।

বহু বছর ধরে এখানে তিনি পোষ্ট মাষ্টারী করছেন। স্বামীজীরা পৌছুতেই যথেষ্ঠ সমাদর করে বসালেন। কিন্তু তক্ষুনি কান্না শুরু করলেন। আঝোরে কেঁদে চলেছেন। কিছুতেই থামছেন না। কান্নায় অভিভূত হয়ে কথা বলতে পারছেন না। দু'চোখে জলের ধারা বয়ে চলেছে।

একী কাণ্ড!

সন্ন্যাসীরা হতভম্ব। মনে করলেন রজনীবাবু নিশ্চয়ই কোন খারাপ সংবাদ পেয়েছেন এই মাত্র। গৃহস্থের ঘরে পা দিয়েই অশুভ সংবাদ শুনতে হবে এটা ভাবতে পারেন নি স্বামিজী। উদ্বিগ্ন হয়ে জিগগেস করলেন স্বামিজী :

—কী হয়েছে? এত কাঁদছেন কেন? বিপদ হলেও চেপে যাবেন না। বলুন।

কোন উত্তর না দিয়ে রজনী বাবু সন্ন্যাসীর পায়ের উপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়লেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তার কান্নার বেগ দ্বিগুণ হয়ে ওঠল। তার চোখের জলে স্বামিজীর পা দুটো ভিজে ওঠল।

স্বামিজী যতই মাথায় হাত বুলান, ততই ডুকরে কাঁদতে থাকেন রজনী বাবু।

স্বামিজী গৃহস্বামীর অজানিত বিপদে কী সান্ত্বনা দেবেন! ঘন ঘন গুরু মহারাজের শুভ নাম স্মরণ করছেন আর গৃহকর্তার মঙ্গল কামনা করছেন। কিন্তু প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গে কান্নার বেগ বেড়েই চলে। এমন পরিস্থিতির মধ্যে এর আগে স্বামিজী কোন দিন পড়েন নি। আমন্ত্রন রক্ষা করতে এসে কি সমস্যায় পড়া হল! উদ্ধারের উপায় কী! সকলের চোখে মুখে সমবেদনার চিহ্ন। কিন্তু এ অবস্থায় নীরবে অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। বাড়ীতে দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি আছে বলে মনে হল না। সন্ন্যাসীদের আসার পর রজনীবাবু একবার মাত্র উপরে গিয়েছিলেন। তারপর থেকেই এই দৃশ্য।

তবে কী স্ত্রী বা পুত্র কন্যা কেউ মারা গেছে?

বেশ খানিকক্ষণ পর কান্নার বেগ একটু কমতেই রজনী বাবুর মুখ দিয়ে প্রায় অর্ধস্ফুট শব্দের মত একটা শব্দ বেরুল।

—ছেলে।

—ছেলের কী হয়েছে, বলুন ?

—উত্তর দিতে পাচ্ছেন না রজনীবাবু।

—আবার অঝোরে কাঁদতে লাগলেন সেই আগের মত।

—নিশ্চয়ই কোন বিপদ হয়েছে ছেলের।

—কী ধরণের বিপদ কে জানে !

ডাকখানা বন্ধ। অন্য কোন লোক নেই। কাকে জিগগেস করা যায় ?

স্বামিজী আবার প্রশ্ন করলেন।

—ছেলের কী হয়েছে বলুন। সংকোচ করবেন না।

কোন উত্তর না দিয়ে রজনীবাবু নিজের পকেট হাতড়াতে লাগলেন। শেষে একটা গাঢ় বাদামী রঙের কাগজ স্বামিজীর সুমুখে তুলে ধরে আবার কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

বোঝা গেল, কাগজটা একটা তার বার্তা। এবং দুঃসংবাদ বাহক কিন্তু চেষ্টা করেও লেখাগুলো পড়া যাচ্ছেনা। চোখের জলে লেপ্টে গেছে। মাখামাখি হয়ে গেছে।

হঠাৎ ইঙ্গিতে রজনীবাবু স্বামিজীদের উপরে যেতে বললেন। উদ্দেশ্যটা বোধ হয় তার স্ত্রীকে সান্তনা বা প্রবোধ বাক্য দেওয়ার জন্য। কিন্তু সিঁড়ি ভেঙে উপরে এসেই আবার তার সেই কান্না। তবে কি ভদ্রলোকের স্ত্রী বিয়োগ হয়েছে ?

না ঘরে কেউ নেই তো ! একেবারে খালি। তবে ?

কয়েক মিনিট পর রজনীবাবু কতকটা স্থির হলেন। চোখের জল কোন রকমে মুছে নিয়ে বললেন :

—ছেলের চাকুরি হয়েছে স্বামিজী।

—চাকুরি হয়েছে তো আনন্দের কথা। কাঁদবার কী আছে ?

সন্ন্যাসীরা আশ্বস্ত হলেন।

রজনীবাবু বিনয়ে নতজানু হয়ে বললেন :

—এ শুধু আপনার কৃপাতেই সম্ভবপর হয়েছে। এ বাড়ীতে পদার্পন করার সঙ্গে সঙ্গেই শুভ তারবার্তাটি পেয়েছি।

স্বামিজী হেসে বললেন।

—এ আপনার ভুল ধারণা। আমরা এসেছি এই একটু আগে, আর আপনার ছেলের চাকুরি হয়েছে কয়েকদিন আগে।

রজনীবাবু উত্তরে দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন :

—আমি অত বোকা নই। আপনি আমায় ছলনা করবেন না। আপনাকে আমি চিনে ফেলেছি। আপনি বর্মাদেশে আসার সঙ্গে সঙ্গেই শুভ সূচনা দেখা দিয়েছে। হাতে হাতে তার ফল পেলাম।

বেশ জোরের সঙ্গে বলে চললেন রজনীবাবু।

তারপর একটু থেমে আনুপূর্বিক ছেলের চাকুরির ইতিহাসটি বলে চললেন।

"এক বছর আগে আকিয়াবে তার অস্থায়ী চাকুরি হয়। সর্ত ছিল বর্মী ভাষায় পরীক্ষা পাশ করলে চাকুরি হবে, নইলে নয়। কিছু দিন আগে একটা টেলিগ্রামে খবর এলো বর্মী ভাষায় ফেল করার দরুণ চাকুরিটা খোয়া গেছে। আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম। কিন্তু আজ আপনি পদার্পন করার সঙ্গে সঙ্গেই সুখবরটা পেলাম। বর্মী ভাষায় পাশ করে কাজটা এবার পেয়েছে।

বলেই এবার সরল শিশুর মত আনন্দে হেসে উঠলেন রজনীবাবু। চাকুরি ও কান্নার কারণটা স্পষ্ট বোঝা গেল। অজ্ঞাতে একটা স্বস্তির নিশ্বাস বেরিয়ে গেল স্বামিজীর মুখ থেকে।

* ১৯৩৭ সালের মে মাসে ঘটনাটি ঘটে। স্বামিবিকাশানন্দজী ব্রহ্মদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচার কার্যে যান। একজন মাত্র ব্রহ্মচারীকে নিয়ে চকপিয়ুতে আসেন।

স্বামীজীদের জাত নেই

গেল, গেল, সব গেল।

ও নন্দ বাবু, কোথায় গেলেন? শীগগীর আসুন। সর্বনাশ হল।

ভুলু পণ্ডিতের ক্রমাগত চীৎকারে বিরক্ত হয়ে প্রায় ছুটে এলেন রঘুনাথ চক্রবর্তী।

—অত চেঁচামেচি করছ কেন? কী হয়েছে?

—রান্নাঘরে কুকুর ঢুকেছে। তৈরী রান্না, ভাত তরকারী সব নষ্ট হয়ে গেল। অত যত্ন করে খরচা করে রান্না। চান করতে গেছেন স্বদেশী বাবুরা। এসেই খাবার চাইবেন। কী হবে? ধমকের সুরে বললেন চক্রবর্তী:

—আগে ব্যাপারটা কী হয়েছে বল। আসল কথার নাম গন্ধ নেই, কেবল গেল, গেল। যত সব.........

ততক্ষণে স্বমিজীদ্বয় ওরফে স্বদেশী বাবুরা চান সেরে ফিরে এসেছেন। ভুলু পণ্ডিত তাদের দেখেই বললেন:

—যা হবার হয়ে গিয়েছে। সব নষ্ট হয়ে গেছে। এ বেলা উপোস থাকতে হবে।

এবার সরোষে ধমক দিলেন চক্রবর্তী, ভুলু পণ্ডিতকে।

—ভূমিকা ছেড়ে সোজাসুজি বল কী হয়েছে, কী নষ্ট হল, কেনই বা মধ্যাহ্ন ভোজন হবে না!

—সন্ন্যাসীরা রান্না শেষ করে চান করতে গেছেন আর সেই ফাঁকে কুকুর ঢুকে পড়েছে পাকশালায়। আমি নিজের চোখে দেখেছি।

একটা ঢোক গিলে নিয়ে পণ্ডিত আবার বললেন, এখন হাঁড়ি কুড়ি সব ফেলে দিতে হবে। আবার নতুন করে………

—কেন হাড়ি কুড়ি ফেলে দিতে হবে?

—এ প্রশ্নের উত্তরে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকিয়ে ভুলু পণ্ডিত বললেন:

—কেন ফেলবে না? কুকুরের উচ্ছিষ্ট রান্না কেউ আবার খায় নাকি? বিশেষ করে স্বামিজীরা। খেলে তাঁরা সদাচার ভ্রষ্ঠ হবেন, জাত যাবে। ব্রাহ্মণ প্রধান বুধহাটা গ্রামে থাকা তাঁদের কঠিন হবে।

ততক্ষণে চান সেরে এসে স্বামিজীরা দু'জনের কথাবার্তা পেছনে দাঁড়িয়ে উপভোগ করছেন আর মিটি মিটি করে হাসছেন। কিন্তু নিজেরা মুখ খুলছেন না।

ভুলু পণ্ডিতের গোঁ চেপে গেল।

—ও খাবার খেলে আলবাৎ জাত যাবে!

জাত যাক বা না যাক, পণ্ডিত যে সোরগোল করে সন্ন্যাসীদের জাত মারার চেষ্টা করছেন এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাঁর চেঁচামেচি শুনে অকুস্থলে গ্রামের কয়েকজন বিশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ কায়স্থও জড় হয়েছেন।

সন্ন্যাসীরা এগিয়ে এসে পণ্ডিতকে সহাস্যে বললেন:

—ওতে কি হয়েছে? ও বেচারাও খাবার খুঁজে বেড়াচ্ছে। ক্ষিধে পেলে সবাই খেতে চায়।

শেষে সরজমিনে দেখার জন্য তারা রান্না ঘরে ঢুকলেন। দেখলেন, সবই যথাস্থানে ঠিক ভাবে আছে। কাজেই তারা নিঃসন্দেহ কুকুর রান্নার জিনিষে মুখ দেয় নি। সঠিক খবরটাও পাওয়া গেল। কুকুর বেড়া ভেঙে ঢোকার চেষ্টা করছিল, খানিকটা দেহ ঢুকিয়ে ছিল কিন্তু ভুলু পণ্ডিতের তাড়া খেয়ে রণে ভঙ্গ

দিয়ে পালিয়ে গেছে। কিন্তু রান্নাঘর তদারকের সাময়িক ভারপ্রাপ্ত ভুলু পণ্ডিতের ব্যাখ্যা অন্যরকম।

—শত হলেও বিষ্ঠা—খাদক কুকুর। পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ্য যে ধরনের ছোঁয়াই হোক না কেন, শাস্ত্র মতে ও রান্না ঘরের খাওয়া উচিত নয়। খেলে পতিত হতে হবে। কিন্তু স্বামিজীরা সর্বভূতে সমান দেখেন। পণ্ডিত ব্রাহ্মণ, শূদ্র, গো, হস্তী, কুকুর সর্ব জীবে কোন ভেদ দেখেন না। জগতের কল্যাণে সেবাধর্মে তাঁরা ঝাপিয়ে পড়েছেন। দুর্ভিক্ষ ও মহামারী অধিকৃত আশাশুনির অন্তর্গত বুধহাটায় সেবা কাজের জন্য এসেছেন তাঁরা। কাজেই তাঁরা ছুঁৎমার্গের বহির্ভূত। প্রয়োজন বোধে তাঁরা গরু মোষের খাবারও সরবরাহ করছেন। কাজেই তাঁদের অভিধানে স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য কোন শব্দ বা ভেদাভেদ নেই। কিন্তু ভবী ভুলবার নয়।

ভুলু পণ্ডিত নাছোড় বান্দা। বাধা দিলেন।

—স্বামিজী আপনারা ও খাবার খাবেন না।

স্বামিজীরা পণ্ডিতের বাধা নিষেধ মানলেন না। শত হাসি ঠাট্টা ও বিদ্রূপ উপেক্ষা করেও বসে গেলেন খেতে। তৃপ্তির সঙ্গেই খেলেন।

স্বামিজীদের খেতে বসে দেখে চক্রবর্তী বিদ্রূপের হাসি হেসে ওঠলেন। চেঁচিয়ে ভুলু পণ্ডিতকে উদ্দেশ্য করে বললেন :

—অত চেঁচামেচি করার আবশ্যক নেই পণ্ডিত। কুকুরের ছোঁয়া লেগেছে তো কী হয়েছে? ওতে স্বামিজীদের জাত যাবে না। জাত যদি যায় তবে কুকুরেরই জাত যাবে।

স্বামিজীরা মনে মনে বললেন। কথাটা ব্যঙ্গ হলেও অর্থপূর্ণ। রঘুনাথ চক্রবর্তী ঠিকই বলেচেন।

স্বামিজীদের আবার জাতধর্ম কী?

তবে শত হলেও পল্লীগ্রাম। স্বামিজীদের কাণ্ডটা চাপা রইল না। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত তাঁত, চরকা, বাঁশ ও বেতের শিক্ষা কেন্দ্রের কর্মী কালীপদ ব্যানার্জীর কানেও কথাটা গেল। তিনিও আশ্রমে খেতেন। কিন্তু সেই দিন থেকে শুকনো খাবার অর্থাৎ চিড়া মুড়ি খেতে স্নুরু করলেন।

স্বামিজীরা জিগগেস করতেই বলেন ঃ

শরীর খারাপ, তাই ভাত খাইনা। কিন্তু বাইরে প্রচার করেন অন্যরকম।

—আরে রামঃ ওদের রান্না, ওদের সঙ্গে খাব কী করে? ওদের যে জাত গেছে ওরা কুকুরের সঙ্গে, এক সঙ্গে খায়, ওদের জাত নেই ধর্ম নেই।

—

* [১৯২৬ সালে স্বামী ধীরানন্দজী (ব্রহ্মচারী নন্দ) এবং স্বামী অব্যয়ানন্দজী (ব্রহ্মচারী রাধেশ্যাম) খুলনায় অশাশুনির দুর্ভিক্ষ অঞ্চলে সেবাকার্যে যান। সেই সময় উপরোক্ত সরস ঘটনা ঘটে।]

প্রত্যাখান ও সমাদর

ল্যাণ্ডস্ড়াউন, ছোট্ট কেন্টনমেণ্ট শহর।

সন্ধ্যা হতেই শহরটি যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। নিরব নিস্তব্ধ। বাইরের জগত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। প্রচণ্ড শীত। সন্ন্যাসীদ্বয় বাস থেকে নেমেই সমস্যায় পড়লেন ঃ

এখন কী করা যায়!

মনে পড়ল সার্বজনীন্ আশ্রয়স্থলটির কথা। আপাততঃ ওখানেই উঠা যাক।

একজন পথচারীকে জিগগেস করতেই—তিনি ধর্মশালার অবস্থিতিটা বলে দিলেন। খুব বেশী দূর নয়।

জিনিষপত্র একটা ঘোড়ার গাড়ীতে চাপিয়ে দিয়ে সন্ন্যাসীদ্বয় ওঠে বসলেন। নির্দেশ দিলেন ঃ

—চলো ধরমশালা।

ধর্মশালার কাছে এসে অনেকটা আশ্বস্ত হলেন সন্ন্যাসীরা।

আর যাই হোক এখানে আশ্রয়ের অভাব হবে না। বহু সারি সারি তালা মারা ঘর রয়েছে। এর একখানা হলেই যথেষ্ট। গাড়ী থেকে মালপত্র নামিয়ে নিয়ে একজন সন্ন্যাসী চেঁচিয়ে ডাকলেন ঃ

—কে আছেন দরজা খুলুন।

শীতের রাতে শীতের শহর। কেউ সহজে বার হতে চায় না। কিন্তু গরজ বড় বালাই। আবার চেঁচালেন স্বামিজী, দরজার উপর ঘন ঘন টোকা মারলেন।

গজ গজ করতে করতে একজন কর্মচারী বেরিয়ে এল। হয়ত দরোয়ান নয়ত জমাদার। কিন্তু মেজাজটা তার মালীকের চাইতেও কড়া মনে হল: প্রায় খেঁকিয়ে উঠল সে।

—এত রাত্রে সোরগোল করছ কেন?

—স্বামিজী বিনীতভাবে বললেন:

—একটু আশ্রয় চাই। আমরা হিন্দু সন্ন্যাসী।

শীতের ঠাণ্ডা দংশন থেকে বাঁচবার জন্য সন্ন্যাসীদ্বয় কান মাথা ও শরীর পাতলা কম্বল দিয়ে মুড়ে রেখেছেন। শুধু চোখ দুটো খোলা। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল লোকটি সন্ন্যাসীদের চোখের দিকে। তারপর কী একটু ভেবে নিয়ে বলল:

—না, এখানে জায়গা হবে না, ভাগো। বলেই দরজা বন্ধ করে ভেতরে চলে গেল।

ততক্ষণে গাড়োয়ান ভাড়া মিটিয়ে নিয়ে চলে গেছে।

এখন কী করা যায়?

হঠাৎ মনে পড়ল সঙ্গের একখানা চিঠির কথা। স্থানীয় এক ভদ্রলোকের নামে একটি পরিচয় পত্র দিয়েছেন একজন ভক্ত, কলকাতা থেকে।

স্বামিজী বার করলেন জামার পকেট থেকে দুমড়ানো চিঠিখানি। সঙ্গের সন্ন্যাসীকে বললেন:

—আপনি বসুন। আমি ততক্ষণে ঘুরে আসি, দেখি ভদ্রলোকের সন্ধান পাই কি না! যদি পাই একটা সুরাহা হতে পারে। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত আপনি এখানেই থাকবেন কিন্তু।

আপাদ মস্তক ঢেকে পার্শ্বস্থ একটি পরিত্যক্ত দড়ির খাটিয়ার উপর দ্বিতীয় সন্ন্যাসী বসে পড়লেন।

তাঁর মনে বিশ্বাস, স্বামিজী যখন গেছেন তখন নিশ্চয়ই একটা

ব্যবস্থা করে আসবেন। স্বামিজী রওনা হওয়ার কয়েকমিনিট পর কি একটা কাজে ধর্মশালায় সেই লোকটি বেরিয়ে এল। স্বামিজীকে খাটিয়ার উপর বসে থাকতে দেখেই রেগে অগ্নি শর্মা হয়ে ওঠল সে কৈফিয়ৎ তলব করল সে।

—কার হুকুমে এখানে বসেছ? কোন সাহসে এখনও এখানে রয়েছ?

বিনীত ভাবে স্বামিজী বললেন ঃ

—খাটিয়াটি খালি পড়েছিল দেখে বসেছি। মাটিতে পা ছোঁয়ানো যাচ্ছেনা, অসম্ভব ঠাণ্ডা।

লোকটি ভয়ানক তর্জন গর্জন ও লম্ফ ঝম্ফ সুরু করল। মারমুখী হয়ে ওঠল। সন্ন্যাসীর আশঙ্কা হল, না জানি গায়ের উপর লোকটি লাফিয়ে পড়ে! মনে মনে সঙ্ঘগুরুকে স্মরণ করতে লাগলেন তিনি।

—লোকটি ক্রমাগত চেঁচাচ্ছে।

বেরিয়ে যাও, এক্ষুনি বেরিয়ে যাও। নইলে……

প্রচণ্ড চিৎকার শুনে ধর্মশালায় আশ পাশের কয়েকজন ছুটে এল। ধর্মশালায় নিশ্চয়ই চোর ডাকাত ঢুকেছে!

একজন গাড়োয়ালী ভদ্রলোক, অবস্থাটা আঁচ করে নিয়ে বুঝলেন, আর যাই হোক চোর ডাকাতের ব্যাপার নয়।

সন্ন্যাসীর কাছে এসে জিগগেস করলেন ঃ

ব্যাপার কী? আপনি কে? কোত্থেকে এসেছেন?

সন্ন্যাসী সব ব্যাপারটি খুলে বললেন। নিজেদের দুরবস্থার কথাও বললেন।

দু'জনের মধ্যে ইংরেজীতে কথাবার্তা হল।

সন্ন্যাসী আরো জানালেন।

—আমার সঙ্গী স্বামিজী গেছেন অন্যত্র আশ্রয় খুঁজে

বার করতে। সে না আসা পর্যন্ত আমাকে এখানে অপেক্ষা করতেই হবে।

ভদ্রলোক জিগগেস করলেন:

—এখানে আসার উদ্দেশ্য কী?

—ধর্ম প্রচারের কাজে এসেছি।

ধর্মশালার লোকটি ভদ্রলোককে দেখে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। অনেকটা বংশবদের মত।

ভদ্রলোক কি একটু ভেবে নিয়ে লোকটিকে আদেশ করলেন:

—মালপত্র আমার বাড়ীর ভেতরে নিয়ে যাও।

আশ্চর্য লোকটি সুবোধ বালকের মতই হুকুমটি তামিল করল।

সন্ন্যাসী সানন্দে স্বগতঃ বলে উঠলেন, 'গুরু কৃপাহি কেবলম।'

আশ্রয় সমস্যা মিটে যেতেই ভদ্রলোক জিগগেস করলেন:

সাধু বাবা, আপনাদের রাতের খাওয়ার কী হবে?

সন্ন্যাসী সরসভাবে উত্তর দিলেন:

—আজ রাতটা বোধ হয় আপনার বাড়ীতেই হবে! আশ্রয় যখন দিয়েছেন তখন······

ভদ্রলোক কিন্তু কথাটার বেশ গুরুত্ব দিলেন, বললেন।

—বেশ তাই হবে, দয়াকরে যদি কষ্ট স্বীকার করেন:

সঙ্গে সঙ্গে তিনি এখানকার জল কষ্টের কথা বললেন।

জলের খুব অভাব। সকাল বিকেলে মাত্র আধ ঘণ্টাটাক জল পাওয়া যায়।

সন্ন্যাসী বললেন:

যাক, অত হাঙ্গামা করবেন না। আমি এমনি বলছিলাম। আশ্রয় দিয়েছেন, ওই যথেষ্ট।

ভদ্রলোক বললেন ঃ

—না, তা হয় না। অমি ভেতর বাড়ী থেকে জল পাঠিয়ে দিচ্ছি।

গৃহকর্তার ঘরে বসে সন্ন্যাসী ভাবছেন স্বামিজীর কথা। তিনি যদি বাইরে দেখতে না পান তাহ'লে চিন্তিত হয়ে পড়বেন। নানা রকম আশংকা করবেন। কিন্তু খানিক পর দেখা গেল ভদ্রলোক সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন স্বামিজীকে। স্বামিজী আশ্রয় সন্ধান নিয়ে নিশ্চয়ই ফিরে এসেছেন।

সহকর্মীকে বহাল তবিয়তে আছেন দেখে অবাক হয়ে গেলেন স্বামিজী।

—হেসে জিগগেস করলেন, ব্যাপার কী ?

সন্ন্যাসী সহাস্যে উত্তর দিলেন।

ডবল প্রমোশন পেয়েছি। ফুটপাত থেকে প্রাসাদে।

—কী করে সম্ভবপর হল ?

—গুরু মহারাজের কৃপায় সবই সম্ভবপর। তারপর আপনার খবর কী ?

—না, ভদ্রলোকের পাত্তা পাওয়া গেল না। পণ্ডশ্রম হল।

ভদ্রলোক সহাস্যে বললেন ঃ

না পেয়েছেন তো ভাবনা কী ? আমার ঘর রয়েছে। তারপর সন্ন্যাসীকে উদ্দেশ করে জিগগেস করলেন ঃ

—জল পেয়েছেন ?

—পেয়েছি।

স্বামিজী ভদ্রলোকের সৌজন্যে খুশী হলেন ঃ

আপনার দয়াতেই আজ আমরা এখানে আশ্রয় পেয়েছি, নইলে অশেষ দুর্গতি হত।

ভদ্রলোক সহাস্যে বললেন :

আমি সব শুনেছি এবং দরোয়ানের দুর্ব্যবহারের জন্য লজ্জিত। এখন হাত মুখ ধুয়ে একটু সেবা করে নিন।

আশ্চর্য! প্রহারের পরিবর্তে জুটল প্রচুর আহারসমাদর। ভদ্রলোকের বাড়ীর তৈরি খাবার। আহারান্তে স্বামিজী জিগগেস করলেন :

—ধর্মশালার লোকটির এমন অশিষ্ট আচরণের কারণটা কী?

ভদ্রলোক বললেন :

কারণ একটা আছে এবং সেটা বেশ গুরুতর।

যেমন?

—স্বদেশী আন্দোলনের আসামীদের ধরবার জন্য পুলিস হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে। সকলের উপরই নির্দেশ আছে সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য বিশেষ করে নবাগতদের উপর। কে কী ছদ্মবেশে আসে কে জানে! তাই দরোয়ান আপনাদের আশ্রয় দিতে চায় নি।

স্বামিজী বললেন :

—এ ধরনের দুর্ভোগ আমাদের প্রায়ই ভুগতে হয়। কিন্তু আমাদের জন্য আপনাকে বিপদগ্রস্ত হতে হবে না তো? তবে বিশ্বাস করতে পারেন, আমরা সত্যই ধর্ম প্রচারক সন্ন্যাসী। রাজনীতির সঙ্গে কোন সংস্রব আমাদের নেই।

ভদ্রলোক বললেন :

—আমি একজন সরকারী কর্মচারী। কাজেই সরকারী বাধা নিষেধ কিছু আছে। তবে সে ভাবনা আমার। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন।

স্বামিজী প্রস্তাব দিলেন :

--একটা ধর্মসভা করলে কেমন হয়? ক্যান্টনমেণ্ট ধর্মসভা, যাগযজ্ঞ করতে দেবে কী?

প্রশ্নটা ভাবিত করে তুলল ভদ্রলোককে। তিনি একটু ভেবে নিয়ে বললেন :

—বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এখানে সভা করা নিষিদ্ধ। সরকারের বারণ। কাজেই যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। এ প্রস্তাব কার্যকরী হবে কিনা বলতে পারিনে।

যুক্তিটা স্বামিজী মেনে নিলেন। তারপর বিনীত ভাবে বললেন :

—তা হয়ত সম্ভবপর হবে না। কিন্তু পারিবারিক অর্থাৎ ঘরোয়া সম্মেলন, পূজা, যাগযজ্ঞাদি ও গীতা পাঠে আপত্তি হবে কি?

গীতা পাঠ

কথাটা ভদ্রলোকের মনের ভেতর একটা নাড়া দিল, তিনি সোৎসাহে বলে উঠলেন :

—বেশ তাই হবে। কাল সন্ধ্যায় আমার বাড়ীতেই গীতা-পাঠের আয়োজন করব। স্থানীয় কয়েকজন ভক্তদের ডাকব। খুশী হয়ে আরো বললেন :

—আপনারা কিন্তু কাল দু বেলা এখানেই সেবা করবেন।

সন্ন্যাসীরা বললেন :

তথাস্তু। যিনি অতখানি করছেন তাঁর আবদার রাখতে হবে বৈ কি।

ভদ্রলোক খুশী হয়ে বিদায় নিলেন।

তিনি স্থানীয় লোকদের কাছে শর্মাজী বলে পরিচিত। সরকারী

ওয়াটার ওয়ার্কসে কাজ করেন। ছোট বড় প্রায় সকলের সঙ্গেই কম বেশী ঘনিষ্ঠতা আছে। জনপ্রিয়তা আছে।

পর দিন সন্ধ্যায় গীতা পাঠের সভায় অনেকেই এলেন। মনে হল ঘুমন্ত শহরটা যেন হঠাৎ গীতা পাঠের আহ্বানে জেগে উঠল। যথা সময়ে স্বামিজী গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা শুরু করলেন। আগ্রহ সহকারে সবাই শুনছেন। এতটুকু গোলমাল বা বিরক্তি নেই শ্রোতাদের। ক্যান্টনমেন্ট সুপারিনটেণ্ডেন্ট শ্রীপদ্মদত্ত যোশী সাগ্রহে সবাইকে আমন্ত্রণ জানালেন গীতা পাঠের জন্য। তারপর আরো কয়েকজন ধর্মপ্রাণ ভদ্রলোক অনুরূপ অনুরোধ জানালেন।

পালা করে চলল গীতা পাঠ। স্থানীয় অন্যান্য হিন্দুগণও এগিয়ে এলেন। প্রচার ও পাঠ পুরোদমে চলতে লাগল।

কথায় বলে আন্তরিক আকাঙ্খা অপূর্ণ থাকে না। শেষে যোশীজীর প্রচেষ্টায় প্রকাশ্য সাধারণের মধ্যে ধর্মসভার অনুমতি পাওয়া গেল।

কড়া বাধা নিষেধের মধ্যেও কী করে—অনুমতি পাওয়া গেল? স্থানীয় লোকরা পর্যন্ত অবাক হয়ে গেল। একদিন আগেও যা অচিন্ত্যনীয় ছিল, আজ তা যেন যাদুমন্ত্রে সম্ভবপর হয়ে উঠল।

শুধু গীতা-পাঠ শোনা নয়। ধর্মোপদেশ গ্রহণের জন্য অনেকেই এগিয়ে এলেন। অনেকদিন থাকার জন্য অনুরোধ জানালেন।

আশ্চর্য বই কি!

যেখানে এক রাত্রির আশ্রয় মিলছিল না, সেখানে সম্বৎসরের আমন্ত্রণ। সাধাসাধি।

প্রচণ্ড প্রত্যাখ্যানের অন্তরালে প্রচুর সমাদর আপ্যায়ন লুকিয়ে ছিল। তাই সন্ন্যাসীদের গোড়াতেই কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে

হয়েছিল। অন্তরাল থেকে যে মহাপুরুষ পরিচালনা করছেন তিনি নিশ্চয়ই সন্ন্যাসীদের দুঃখ কষ্ট দেখে মুচকি হাসছেন।

কই সে ধর্মশালার বীর পুঙ্গবটি? সে সন্ন্যাসীদের কাছে আসতে নিশ্চয়ই সাহস পাচ্ছে না। তাই ছায়ার মত ঘুর ঘুর করছে।

লোকটি কেঁদে ভেঙে পড়ে বলল:

—সাধু বাবা আমায় ক্ষমা করুন।

স্বামিজী কিন্তু তাকে বুকে টেনে নিয়ে সস্নেহে আলিঙ্গন করলেন। *

* ১৯৩৮ সালের কথা —। স্বামী বিকাশানন্দজী ও প্রজ্ঞানন্দজী প্রচার কাজের জন্য গিয়েছিলেন।

কে শুচি ?

গৃহস্বামী হঠাৎ গর্জে উঠলেন। হাতের খাতাটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ভৎসনার সুরে চারণ দলকে উদ্দেশ করে বললেন:

—ছিঃ ছিঃ, তোমরা মুচির কাছেও ভিক্ষার জন্য হাত বাড়াও ?

দলনেতা বিনীত ভাবে জানালেন:

—আমরা প্রত্যেক হিন্দুর দ্বারেই যাই। উঁচু নীচু স্তরের বিচার আমরা করিনে। আমাদের কাছে সব মানুষই সমান। এ কথার উত্তরে ব্রাহ্মণ গৃহস্বামী আরো রেগে গিয়ে কাঁপতে-কাঁপতে বললেন:

—জানেন আপনাদের এ খাতা ছোঁয়ার জন্য আমাকে এ সন্ধ্যে বেলায় চান করতে হবে। কারণ, ওতে মুচির হাতের সই রয়েছে।

উপেক্ষিত খাতাটি ভারপ্রাপ্ত স্বামিজী সযত্নে হাতে তুলে নিলেন। তাঁর কেবলই মনে হতে লাগলো, এ কি অদ্ভুত আচরণ করলেন ব্রাহ্মণ গৃহস্বামী। তিনি সঙ্ঘ চারণদলের ভাবোদ্দীপক গান শুনে খুশী হয়ে ডেকে এনেছিলেন তার বাড়ীতে। চাঁদা দেবার আগ্রহে খাতাখানি চেয়ে নিয়েছিলন। আশ্বাস দিয়েছিলন। অথচ তিনি নিশ্চিত জানেন গুজরাটের এই ভীরমগামে চাঁদার অভাব হবে না। কিন্তু এ কি করলেন তিনি ? নিজে হিন্দু হয়ে অন্য একজন হিন্দুকে অপমান করলেন। দেবভক্ত মুচির নাম খাতায় দেখে খাতাটা অপবিত্র হয়েছে বলে ঘৃণায় ছুঁড়ে ফেলে দিলেন ! সেই মুচি-দাতা তার ঘরে সশরীরে আসেন নি। ব্রাহ্মণকে স্পর্শ করেন নি। আশ্চর্য !

এরই নাম কি সাত্ত্বিক নিষ্ঠা ?

না, না, এ দম্ভ, অনাচার, ঘোর অবিচার ! মানুষের অত বড় অমর্যাদা অসহ্য। এমন লোকের কাছ থেকে দান নেওয়া যায় কী ?

স্বামিজীকে ভাবিত দেখে গৃহস্বামী তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। উত্তেজিত হয়ে বললেন ঃ

—কি ভাবছ ? ওই সব ম্লেচ্ছরা আবার সনাতন ধর্ম বিরোধী. বর্ণাশ্রম বিরোধী। এতে হিন্দু সমাজ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। বেরোও তোমরা বাড়ী থেকে। এক পয়সাও চাঁদা দেব না।

স্বামিজী অন্তরে জ্বলে পুড়ে মরছিলেন। কোন রকমে উত্তেজনা সামলে নিয়ে দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর দিলেন ঃ

—এ অন্ধ গোঁড়ামিই ব্যাপক ধর্মান্তরের কারণ। এই জন্যই আপনাদের সমাজ খণ্ড বিখণ্ড ও দুর্বল হয়ে পড়ছে। এমন অন্ধ-গোঁড়ামি সনাতন ধর্মের আদর্শ নয়। বর্ণাশ্রমের মূল আদর্শের সঙ্গে এর কোন সঙ্গতি নেই।

কিন্তু সন্ন্যাসীর কোন যুক্তিই গৃহস্বামী শুনতে রাজী নন। তাঁর একই কথা।

—ছিঃ ছিঃ, তোমরা মুচির কাছেও ভিক্ষার জন্য হাত বাড়াও ?

সন্ন্যাসী মুচির অপমান সমগ্র মনুষ্য জাতির অপমান বলে মনে করলেন, বললেন ঃ

—সেই দাতা একজন উদারপ্রাণ হিন্দু. তাঁর স্বাক্ষর স্বদেশপ্রেম, সমাজহিতৈষণা ও স্বধর্ম-নিষ্ঠারই উজ্জ্বল সাক্ষ্য। মুচি হয়েও তিনি শুচি। এবং অনেক হিন্দুর মধ্যে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ হিন্দু।

সন্ন্যাসীর কথা আমল দিলেন না গৃহস্বামী। ত্রস্তে চান করতে চলে গেলেন। তার কাছ থেকে বঞ্চিত ও অপমানিত হয়ে ফিরলেন চারণদল। কিন্তু আত্মবঞ্চনা করলেন না। মানবতার প্রতি অবজ্ঞা ও ঘৃণা তাঁদের উদার মনকে ব্যথাতুর করে তুলল। দ্রুতপদে সন্ন্যাসীরা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।*

---

* ১৯৩৪ সালের ঘটনা। গুজরাটের অন্তর্গত ভীরমগামে প্রচারে গিয়েছিল সঙ্ঘের চারণদল।

উল্‌টো বুঝলি রাম

'নিকল যাও, নিকল যাও, শহরকে বাহার যাও"। মহাদেব মন্দিরের বাইরে জনতা ক্রমাগত চিৎকার করছে। মন্দিরের মধ্যে আশ্রিত সন্ন্যাসীগণ তাদের এই অভাবিত আচরণ দেখে হতভম্ব। হঠাৎ এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ হল যা'র জন্য এমন অশালীন আচরণ করছে তারা। তারাই তো সমাদর করে এনে মন্দিরে আশ্রয় দিয়েছে। সাদরে গ্রহণ করেছে। কাঠিওয়াড়ী ভাষা না বুঝলেও সন্ন্যাসীরা হিন্দী বোঝেন। স্থানীয় লোকেরা যে আর আশ্রয় দিতে রাজী নন তা' তাদের ভাষার অতিরিক্ত মুখও হাতের উগ্রভঙ্গী দেখে স্পষ্ট বুঝতে পেরেছেন। কিন্তু অপরাধটা কী জানে না।? জানতে পারলে গুরুত্বটা বুঝতে পারতেন।

সন্ন্যাসীদের মনের দুঃখ, সবে জিনিস-পত্র গোছগাছ করে তাঁরা গুরু মহারাজের আসন সাজাচ্ছিলেন। কিন্তু তা সম্পূর্ণ করতে পারলেন না।

এমন তো কোনদিন আজ পর্যন্ত হয়নি! আসন অসম্পূর্ণ বা পূজা অসমাপ্ত রেখে পালাতে হয়নি।

সন্ন্যাসী এগিয়ে এসে বিনীতভাবে জিগগেস করলেন, আপনারা এমন ব্যবহার করছেন কেন? আমরা কি অপরাধ করেছি? যদি অন্যায় হয়ে থাকে তা'হলে নিশ্চয়ই সংশোধনের চেষ্টা করব।

উত্তরে জনতা মারমুখী হয়ে এল। একজন বলল:

যদি এক্ষুনি না যাও তবে জিনিসপত্র টেনে বাইরে ফেলে দেব।

সঙ্গে সঙ্গে আর একজন দাঁত মুখ খিঁচিয়ে হাতের মুষ্টি দেখিয়ে বলল ঃ

উত্তম-মধ্যম দিয়ে বিদেয় করব এখান থেকে। তোমরা গুপ্তচর, সাধু সেজে বেড়াচ্ছো আর চালাকি চলবে না। হাতে-নাতে ধরা পড়েছ।

একি অদ্ভুত নালিশ?

চারণদল গুপ্তচর! বলে কী ওরা?

সন্ন্যাসীদের কাছে নালিশটা দুর্বোধ্য থেকে গেল। কিন্তু বোঝাবার বা দ্বন্দ্ব মীমাংসা করবার ফুরসৎ নেই। এখন মহাজন পন্থা অবলম্বন করা ছাড়া উপায় নেই। 'য পলায়তি সঃ জীবতি।'

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এ রাত্রিতে কি করে মালপত্র নিয়ে অন্যত্র যাওয়া যাবে? সন্ধ্যার পরই গাড়ী ঘোড়া সব বন্ধ হয়ে যায়। যানবাহন পাওয়া অসম্ভব। অন্ততঃ একটি রাত্রের জন্যও অনুমতি চাওয়া যাক। কিন্তু স্থানীয় লোকদের অপ্রত্যাশিত আচরণ দেখে প্রস্তাবটি পেশ করতে সাহস হয় না। এ বিপদে গুরু মহারাজের শরণাগত হওয়া ছাড়া উপায় নেই। সন্ন্যাসীগণ মনে মনে তাই করলেন।

হঠাৎ ভিড় ঠেলে একজন ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। জিগগেস করলেন ঃ

—আপনি লোক-সব কোথা থেকে আসিয়াছ?

ভদ্রলোকের মুখে বাংলা ভাষা শুনে সঙ্ঘ-সন্ন্যাসীগণ আশ্বস্ত হলেন।

যাক, এই ভদ্রলোককে অবস্থাটা বুঝিয়ে বললে হয়ত কিছু কাজ হবে। তিনি জনতাকে বুঝিয়ে দেবেন আর তার মাধ্যমে নিজেদের অপরাধটাও বুঝে নেওয়া যাবে।

ভদ্রলোকের ভাষাটা গুরু-চণ্ডালী হলেও এটা স্পষ্ট বোঝা গেল যে গুরু কৃপাতেই তা'র আবির্ভাব ঘটেছে।

ডুবন্ত মানুষ যেমন ভাসমান তৃণকে আঁকড়ে ধরে প্রাণ রক্ষার চেষ্টা করে, সন্ন্যাসীগণ তেমনি এ ভদ্রলোককে ধরে আসন্ন বিপদ থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা করলেন। জিগগেস করলেন ঃ

—আপনি কি বাঙ্গালী ?

—না। তবে—হামি ঝরিয়া থাকে, সেখানে আমার অনেক বাঙ্গালী মিত্র আছে।

ভদ্রলোকের কথার মধ্যে ভদ্র ও সহানুভূতির ছাপ স্পষ্ট রয়েছে। তাই সাহস পেয়ে সন্ন্যাসী প্রশ্ন করলেন ঃ

—আচ্ছা বলতে পারেন, ওরা আমাদের প্রতি হঠাৎ এমন অপ্রসন্ন হলেন কেন ? আমরা কোন অন্যায় করেছি বলে তো মনে হয় না।

উত্তরে ভদ্রলোক বললেন ঃ

—ইনলোক্ কো বিশ্বাস কি আপন লোক সব কংগ্রেসী আছেন তাই।

—এমন উদ্ভট ধারণার কারণ কি ?

—ওয়াধওয়ান ক্যাম্পকা কংগ্রেসী নেতা এ্যাডভোকেট সাহেব আপন লোকের সাথে বাতচিত করে গেছে। ইনলোক সব দেখেছে।

সন্ন্যাসীদের মনে পড়ল।

সত্যিই তো খানিক আগে সেই অপরিচিত কংগ্রেসী এ্যাডভোকেট এসেছিলেন খোঁজ খবর নিতে, আর দশজনের মত। তিনি সম্পূর্ণ অপরিচিত। কিন্তু তা'র ক্ষণিকের আগমনে যে এত বড় রামকাণ্ড হবে তা' কে জানত ?

সন্ন্যাসী বললেন ঃ

—বিশ্বাস করুন। আমরা সনাতনী সন্ন্যাসী। এখানে নতুন

এসেছি এবং প্রথম। কাউকে চিনিনে। ও কংগ্রেসী ভদ্রলোকের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। উনি নতুন লোক দেখে অমনি খোঁজ খবর নিয়ে গেলেন। আমাদের রাজনীতির সঙ্গে কোন সংস্রব নেই, আমরা এসেছি হিন্দু ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য। এখন আমাদের একান্ত অনুরোধ অন্ততঃ এ রাতটা এখানে থাকতে দিন। অত জিনিস-পত্র নিয়ে রাত্রে কোথায় যাব? তা' ছাড়া যানবাহন পাওয়া যাবে না।

ভদ্রলোক মনোযোগ দিয়ে কথাগুলো শুনলেন। তারপর জনতাকে উদ্দেশ করে আঞ্চলিক ভাষায় কী সব বললেন। ভদ্রলোকের বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে জনতা শান্ত হল। সাপের মাথায় যেন ওঝার মন্ত্র পড়ল! তাদের তর্জন গর্জন, ফোঁস ফোঁসানি বন্ধ হয়ে গেল। ধীরে ধীরে তারা চলে গেল।

সন্ন্যাসীরা ধড়ে যেন প্রাণ ফিরে পেলেন। বুঝলেন, তাঁদের আর্জি মঞ্জুর হয়েছে এবং রাত্রে আর উৎপাত হবে না। অসমাপ্ত ঠাকুরের আসন সাজালেন। রাত্রি এগারটা অবধি নিরবচ্ছিন্নভাবে পূজা, ভজন ও কীর্তন করলেন। অপূর্ণ মনের সাধ পরিপূর্ণভাবে মেটালেন।

কর্মসূচী অনুযায়ী পরদিন ভোরে উঠে ঊষা আরতি সেরে নগর পরিক্রমায় তারা বেরুলেন। সুমধুর সুরে "গুরু কৃপাহি কেবলম্" সঙ্গীতটি গেয়ে বেড়ালেন। ওয়াধওয়ান সিটির বাসিন্দাদের মনের বিরূপভাব একেবারে দূর হয়ে গেল। সকাল হতেই কয়েক জন এসে মহাদেব মন্দিরে হাজির হলেন।

সন্ন্যাসীরা প্রমাদ গণলেন!

আবার কী হল?

সন্দেহটা নিরসন করলেন ধর্মপ্রাণ ভক্তগণ।

—আপনাদের ভজন কীর্তন আমাদের খুব ভাল লেগেছে। আমাদের ইচ্ছা আপনারা রোজ এরকম ভজন কীর্তন করেন। যতদিন ইচ্ছা এখানে নিশ্চিন্তে থাকুন। আর আমাদের গত কালের ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চাইছি।

শুনে সন্ন্যাসীরা খুশী হলেন। তবে প্রথমে এই স্তুতিগুলো তাঁদের কাছে অনেকটা 'ভূতের মুখে রাম নামের মত' মনে হচ্ছিল। তবু মন্দের ভাল। ইংরাজীতে যাকে বলে 'বেটার লেট ঘ্যান নেভার।'

পরে দেখা গেল যারা মেরে তাড়িয়ে দিতে এসেছিল, তারাই সন্ন্যাসীদের সেবার জন্য রোজ ভাণ্ডারা দিতে লাগলেন। শেষে এতটা আপন করে নিল যে কিছুতেই ছাড়তে চাইল না। সঙ্ঘের চারণ দল পর পর বিশ দিন ভজন কীর্তন প্রবচনাদি করলেন।

বিদায়ের দিনে ওয়াধওয়ান নাগরিকদের অনেকেই এসে সজল চক্ষে রেল স্টেশনে সন্ন্যাসীদের বিদায় সম্ভাষণ জানালেন। তা'দের আন্তরিকতায় ভুলে গেলেন সন্ন্যাসীরা সেদিনকার অপমান লাঞ্ছনা! একজন একজন করে সকলকেই তারা প্রেমালিঙ্গন করলেন! ট্রেন ছেড়ে দিল। নাগরিকগণ চেঁচিয়ে অনুরোধ জানাল ঃ

স্বামিজীরা আবার আসবেন![১]

---

[১] ১৯২৫ সালের মে মাসে সঙ্ঘের চারণদল ওয়াধওয়ান শহরে যান। এই শহরটির বর্তমান নাম সুরেন্দ্রনগর। ঘটনার সময়—কাঠিয়াবাড় ছিল দেশীয় রাজ্য। ওখানে স্বদেশী আন্দোলন নিষিদ্ধ ছিল। তাই স্থানীয় লোকেরা কংগ্রেসী লোকদের প্রতি বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন ছিল।

উদর নিমিত্তং

ভদ্রলোক বিনীত ভাবে নিবেদন জানান :

—স্বামিজী, আমার একটা আবদার রক্ষা করতে হবে। আমি এই আজমগড় শহরের একজন সামান্য ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। আমি আপনাদের ভজন-কীর্তন শুনে খুবই প্রীত হয়েছি।

স্বামিজী খুশী হয়ে বললেন :

—বেশ তো, মাঝে মাঝে আসবেন। আমাদের নিত্য পূজানুষ্ঠানে কীর্তন, ভজন হয়। আমরা যুক্ত প্রদেশের এই শহরে প্রথম এসেছি কাজে। আপনার সাহচর্য পেলে খুশী হব।

ভদ্রলোক সম্মতি জানিয়ে বললেন :

—আমার সামান্য আবদার। এক সপ্তাহের জন্য আমাকে সাধু সেবার ভার দিতে হবে। এ আমার একান্ত ইচ্ছা। এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত করবেন না আশা করি।

স্বামীজী সহাস্যে বললেন :

—বেশ, তাই হবে। আপনার আমন্ত্রণ আমরা সাদরে গ্রহণ করলাম।

ভদ্রলোক স্বামিজীর মত পেয়ে খুবই খুশী হলেন। এবং সাধু সেবার জন্য প্রচুর আহার্যের জোগাড় করলেন। ক্রমাগত সাতদিন ধরে দিনে তিন বেলা সন্ন্যাসীদের তিনি প্রচুর খাতির যত্ন করে সেবা করলেন। এতটুকু ক্রটি হয় নি। এ বিষয়ে তাঁর প্রখর দৃষ্টি। বাড়ীর লোক ও কর্মচারীদের উপর ঢালাও আদেশ, সন্ন্যাসীদের প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহের যেন এতটুকু ক্রটি না হয়। সত্যিই খুশী হলেন সঙ্ঘ-সন্তানগণ ভদ্রলোকের আন্তরিকতাপূর্ণ আতিথেয়তা দেখে।

প্রসঙ্গক্রমে ভদ্রলোক একদিন সঙ্ঘের উদ্দেশ্য ও কর্মধারা সম্বন্ধে আনুপূর্বিক জেনে নিয়েছেন, আলোচনা করেছেন। তিনি সশ্রদ্ধ ভাবে স্বামিজীর ও অন্যান্য সন্ন্যাসীদের কথা শুনেছেন। উচ্চ শিক্ষিত, উচ্চ পদস্থ কর্মচারীর পক্ষে এ রকম আচরণ স্বাভাবিক। বিশেষ করে এ শ্রেণীর ভক্তদের কাছ থেকে। স্বামিজী স্থির করলেন ভক্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর এককালীন দানের জন্য অনুরোধ করবেন না। তিনি সাধ্যমত যথেষ্ট সেবা যত্ন করেছেন। যৎসামান্য চাঁদা, ইচ্ছে করে যা দেন তাই গ্রহণ করা হবে সানন্দে। দেখা যাক ভদ্রলোক নিজে এ সম্বন্ধে কিছু বলেন কি না!

স্বামিজীর বিশ্বাস। নিশ্চয়ই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ভদ্রলোক কিছু বলবেন। যা বলে থাকেন দশজন ভক্ত।

ভদ্রলোক ভিক্ষাও চাঁদার প্রসঙ্গটা তুললেন।

—স্বামিজী আপনারা চাঁদা, ভিক্ষা—এসব তোলেন কেন? ওসবের কী দরকার?

—প্রতিষ্ঠানকে বাঁচাতে হলে, কর্মসূচী বাড়াতে হলে, জনহিতকর কাজ করতে গেলে বিপুল অর্থের প্রয়োজন।

উত্তরটা শুনে ভদ্রলোক হেসে ভেঙে পড়লেন। হাসির বেগ কমলে পরে নিজের ভুড়িটি অঙ্গুলি সংকেতে দেখিয়ে বললেনঃ স্বামিজী! যো কুচ হ্যায়, সব এহি ওয়াস্তে, ভুখ মিট গিয়া তো সব মিট গয়া। বলেই টেনে টেনে বিজ্ঞের হাসি হেসে চললেন তিনি।

স্বামিজী হতভম্ব।

শিক্ষিত, উচ্চপদস্থ কর্মচারী হয়ে একি বলছেন তিনি! উদর ভিন্ন অন্য কিছু বোঝেন না। অথচ একদিন তাঁর আচার ব্যবহারে মনে হয়েছিল তিনি একজন উঁচুস্তরের ভক্ত গৃহী। নইলে এমন নিষ্ঠার সঙ্গে অত অর্থ ব্যয় করে সাধুদের সেবা যত্ন করতেন না। তার কী ধারণাটা ভিত্তিহীন?

মনে একটা সন্দেহের দোলা লাগল।

কি একটু ভেবে নিয়ে ভদ্রলোক নিজেই আবার স্বামিজীর সন্দেহের অবসান ঘটালেন।

—স্বামিজী, আমি মানুষকে খাওয়াতে প্রস্তুত। কারণ, উদরের চাহিদা মিটে গেলে তুনিয়ায় আর কি চাই? এর জন্যই তো সব। লেখা পড়া, চাকরি বাকরি, সংগ্রাম। তাই এক পয়সাও নগদ দান খয়রাত বা চাঁদা দিতে রাজী নই। যতদিন ইচ্ছা খান, থাকুন।

ভদ্রলোকের প্রতি উঁচু ধারণাটা নিমেষের মধ্যে ধূলিস্মাৎ হয়ে গেল। স্বামিজী মনে ব্যথা পেলেন। ভাবলেন, ভদ্রলোক ঘোরতর জৈব স্তরের। উদর সর্বস্ব। তার যুক্তি মেনে নিলে মানুষের আধ্যাত্মিক মহিমাকেই অপমান করা হয়। শুধু পেটে খেয়ে কি মানুষ সুখী হতে পারে? আত্মাও নিত্য বুভুক্ষু। সেই বুভুক্ষু আত্মার তৃপ্তি সাধনের জন্য অন্ন সঞ্চয় করতে হয়।

কিন্তু প্রকাশ্যে তিনি কিছু বললেন না। কারণ, তিনি নিশ্চিত ভদ্রলোক যুক্তিতর্কের ধার ধারেন না। সাধু পরিচর্যা করেই তিনি ভক্তের দায়িত্ব পালন করেছেন বলে তার বদ্ধমূল ধারণা। কিন্তু একেবারে চুপ করে থাকাও সমীচীন নয়। তাই স্বামিজী নম্র কণ্ঠে বললেন:

—আপনি যে সন্ন্যাসীদের পরিচর্যা করেছেন, তা'রা তো পেটের দায়ে ত্যাগধর্ম অবলম্বন করেন নি। আত্মা মুক্তি ও জগতের কল্যাণই তাঁদের জীবনের পরম লক্ষ্য।

স্বামিজীর উক্তিটা শুনে ভদ্রলোক হো হো করে সশব্দে হেসে উঠলেন। তারপর সগর্বে একটু দেহ সঞ্চালন করে বলে উঠলেন:

—সর্বং উদর নিমিত্তং।

— - —

বুজরুকি

ভোর কেটে সকাল হয়েছে।

গুরু পূজারতিও শেষ হয়েছে।

এক্ষুনি বেরুবেন সঙ্ঘ-সন্তানগণ।

দুপুরে কাণপুর শহরে প্রচণ্ড গরম পড়ে। কোন কোন সময় লু ছোটে।

দলের নেতা বিকাশানন্দের নির্দেশে চারণ দল তৈরী হয়ে নেয়। হঠাৎ ধর্মশালার ঘরের সুমুখে বিরাট চীৎকার ও হল্লা সুরু হয়।

বেরুতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়ে চারণদল।

ক্রমাগত চীৎকার করে প্রতিবাদ জানাচ্ছে জনতা।

—এ সব বুজরুকি চলবে না। বন্ধ কর, বন্ধ কর, তোমাদের বুজরুকি, ভণ্ডামি অসহ্য।

মারমুখী হয়ে উঠল জনতা।

স্বামিজী ভেবে পেলেন না, বুজরুকির কী হল! ক'দিন ধরেই তো এই শহরে চলছে তাঁদের ধর্ম প্রচার ও অর্থ সংগ্রহ। এবং প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা পূজারতি না করে তাঁদের কেউ জল পর্যন্ত গ্রহণ করেন না।

লোকগুলো বলছে কী? ওদের কী মাথা খারাপ হয়েছে? নইলে এমন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে কেন?

অনেক কথাই মনের আনাচে কানাচে ঘুরচে। কিন্তু দোষ ত্রুটি চোখে পড়চে না।

এ আবার কী কঠিন পরীক্ষায় পড়া গেল! স্বামিজী এগিয়ে এসে জিগগেস করলেন :

—কেন আপনারা এরকম ব্যবহার করছেন? আমরা কী অন্যায় করেছি? ঠাকুরের পূজা আরতি করছি। একে কি বুজরুকি বলে?

জনতার মধ্য থেকে একজন আর্যসমাজী এগিয়ে এসে উগ্রভাবে অভিযোগ করল।

—তোমরা ব্যক্তির পূজা, মূর্তি পূজা করছ। এ নিতান্ত অবৈদিক, কুসংস্কার পূর্ণ। যদি বন্ধ না কর তাহলে তোমাদের ঠাকুরের মূর্তি রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দেব।

লোকটির ঔদ্ধত্য অসহ্য।

ঠাকুরের অবমাননা কিছুতেই বরদাস্ত করা চলে না। রেগে ওঠলেন স্বামিজী। রুদ্র মূর্তি ধারণ করলেন। গোঁয়ার লোকটিকে সমুচিত শিক্ষা দেবেন বলে।

—ক্ষমতা থাকে তো ঠাকুরের শ্রীমূর্তিতে হাত দিয়ে দেখ।

প্রবল বিক্রমে লোকটির পথ আগলে দাঁড়ালেন স্বামিজী?

লোকটি তারস্বরে চেঁচিয়ে লম্ফ ঝম্ফ শুরু করল।

আর সব স্বামিজীরাও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, প্রাণ থাকতে ঠাকুরের অবমাননা সহ্য করবেন না তাঁরা।

এমনি সময় হঠাৎ একজন বলিষ্ঠকায় স্থানীয় লোক ভিড় ঠেলে সবেগে এগিয়ে এলেন। আক্রমণকারী লোকটিকে ভর্ৎসনা করে এক ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে বললেন :

—বেরিয়ে যাও ঘর থেকে, নইলে ভাল হবে না।

প্রতিবাদী লোকটি ভদ্রলোককে যা' তা' বলে গালাগাল শুরু করল।

দেখতে দেখতে সংগ্রামের মোড় ঘুরে গেল।

আত্মরক্ষায় প্রস্তুত সন্ন্যাসীদের ভূমিকারও পরিবর্তন হল।

বলিষ্ঠ ভদ্রলোক রাগত ভাবে সন্ন্যাসীদের ইঙ্গিতে দেখিয়ে বললেন :

—এরা প্রকৃত সাধু, নইলে তোকে সমুচিত শিক্ষা দিতেন। কিন্তু আবার গোলমাল করলে আমি ছাড়ব না। এমন সায়েস্তা করব, জীবনে ভুলবিনে। বাঁচতে চাস তো বেরিয়ে যা, পালা। বলেই সজোরে লোকটির গায়ে একটা ধাক্কা দিলেন।

লোকটি ধাক্কা সামলাতে না পেরে পিছিয়ে এল। কিন্তু মূর্তি পূজার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতে ছাড়ল না। শেষ পর্যন্ত রণে ভঙ্গ দিয়ে সদলে পালিয়ে যেতে বাধ্য হল।

সন্ন্যাসীরা নিশ্চিন্ত হলেন। হাতাহাতি করতে হল না। অভাবিত ভাবে সমাধান হয়ে গেল সমস্যাটা।

ভদ্রলোক সন্ন্যাসীদের উদ্দেশ করে বললেন :

—আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। আর বাড়াবাড়ি করবে না মূর্খ লোকটি। আপনারা নিঃসন্দেহে সঙ্ঘের জনকল্যাণ কাজে বেরুতে পারেন। এতটুকু সংকোচ করবেন না।

সন্ন্যাসীরা যথারীতি চারণদলকে নিয়ে সঙ্ঘের প্রচার কাজে বেরিয়ে গেলেন। কাজ সেরে ফিরলেন খুশী মনে। বেরুবার আগে যে খণ্ডযুদ্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল তা' তৎক্ষণে তাঁদের মনের পট থেকে মিলিয়ে গেছে। ঠাকুর শুধু তাঁদের কর্মশক্তি দেন নি। ক্ষমাগুণও প্রচুর পরিমাণে দিয়েছেন। *

কানপুরে এই চারণ দলের নেতা ছিলেন স্বামী বিকাশানন্দজী

গীতাজ্ঞান

ডিহি শ্রীরামপুরের ছোট্ট ভাড়াটিয়া বাড়ী।

স্বামিজী আপিস ঘরে উবু হয়ে বসে লিখছেন। ধ্যান যোগী মহাদেবের মত একনিবিষ্ট মনে। গুরু দায়িত্ব পূর্ণ সম্পাদকীয়। আশ পাশের প্রতি তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন। কোথায় কী হচ্ছে না হচ্ছে, কাজের সময় এতটুকু ভাবেন না।

সমানে লিখে চলেছেন। লেখা কখন শেষ হবে কে জানে! আবার শেষ না হলে শত প্রয়োজনেও কারো স্বামিজীর কাছ ঘেঁষার সাহস নেই। তিনি যেমনি প্রাজ্ঞ তেমনি কঠিন। কাজের সময় এতটুকু ব্যাঘাত বরদাস্ত করেন না। কঠিন নিয়মানুবর্তিতার অধীন।

আশ্রমের সবাই জানেন, তাই তটস্থ।

খুব প্রয়োজন না পড়লে কেহ বড় একটা কাছ ঘেঁষেন না।

কিন্তু বাজিতপুরের আধপাগলা ছেলেটা অতশত বোঝে না। মাঝে মাঝে তা'র মনে নানা রকম প্রশ্ন জাগে। জ্ঞান পিপাসায় যেন ওষ্ঠাগত প্রাণ।

হঠাৎ খেয়াল হল, তা'র একটা বিশেষ ধর্ম রহস্য উদঘাটন করতে হবে। আর যদি তা জানতে হয় তাহলে এই স্বামিজীই উপযুক্ত ব্যক্তি। আস্তে আস্তে সে এসে স্বামিজীর কাছে দাঁড়াল।

স্বামিজী বিষয় বস্তু মনন, অনুধ্যান ও লিখনে ব্যস্ত।

'স্বামিজী', 'স্বামিজী' বলে বার দুই আস্তে আস্তে ডাকল ছেলেটি।

স্বামিজী লেখায় তন্ময়। তাই কানে তাঁর ডাক পৌঁছুল না।

কিন্তু সে নাছোড়বান্দা। একবার ঝোঁক উঠলে সহজে যাবে না। সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে, গীতা সম্বন্ধে কৌতূহলপূর্ণ প্রশ্নটার উত্তর সে জানবেই এবং এক্ষুনি।

আবার একটু উচু স্বরে ডাকল সে :

—স্বামিজী !

স্বামিজী শুনেও শুনলেন না। হাতের কাজ বন্ধ করে বিষয়ান্তরে মনোযোগ দেবেন না। লিখেই চলেছেন। লেখা শেষ করতেই হবে।

কিন্তু ওদিকে ছেলেটির জ্ঞান পিপাসা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে জিদও বাড়ছে।

হঠাৎ তার মাথায় একটা বুদ্ধি এল। সে হস্তস্থিত গীতাখানি স্বামিজীর চোখের সুমুখে তুলে ধরে জিজ্ঞাস করল :

—স্বামিজী, ধর্মক্ষেত্রই যখন তা আবার কুরুক্ষেত্র হ'ল কী করে ?

স্বামিজী বহু কষ্টে ধৈর্য ধরে এতক্ষণ উৎপাত সহ্য করছিলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত আর সহ্য করতে পারলেন না। কোন উত্তর না দিয়ে মনোযোগ দিয়ে লেখার উপায় নেই। কাজেই 'গীতাতত্ত্বের রহস্যটা তা'কে সমুচিত ভাবেই বোঝান দরকার। যেন আর কখনও এসে কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি না করে সে। উপদেশের চাইতে এক্ষেত্রে বাস্তব দৃষ্টান্তই যে বেশী উপযোগী, এ বিষয়ে স্বামিজী নিঃসন্দেহ।

আবার বিরক্ত করতেই স্বামিজী হঠাৎ বাঘের মত লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। বাঁ হাতে ছেলেটির টুঁটিটা ধরে ডান হাত দিয়ে সজোরে গালে এক চড় বসালেন। তারপর বললেন : বুঝলিতো ধর্মক্ষেত্র কী করে কুরুক্ষেত্র হয় ? এই আশ্রম হল ধর্মক্ষেত্র, এক্ষুণি কুরুক্ষেত্র হয়ে গেল। বুঝলি তো ? বলেই হেসে ফেটে পড়লেন।

ছেলেটি চপেটাঘাত খেয়ে হতভম্ব হয়ে গেল। খানিক পরে সম্বিৎ আসতেই বুঝল, গীতাজ্ঞান আহরণেরও সময় অসময় আছে। পরক্ষণেই স্বামিজী তাকে সস্নেহে বুকে টেনে মাথায় হাত বুলালেন।

মুখে আওড়ে চললেন :

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয়॥

ধীরে ধীরে বুঝিয়ে দিলেন মর্মার্থটা। খুব সরল সহজ ও সুন্দর ভাবে।

খুশী হয়ে স্বামিজীকে প্রণাম করে বলল ছেলেটি :

—স্বামিজী আমার ভুল হয়েছে। কাজের সময় আর কখনও…

স্বামিজী সানন্দে তা'কে আবার বুকে জড়িয়ে ধরলেন, বললেন :

—কে বলে তুই পাগল? হাঁ বলতে পারে 'জ্ঞান' পাগল। বলেই স্বামিজী তৃপ্তির হাসি হাসলেন। এমন সবাই যদি গীতাজ্ঞান পাগল হত!*

---

* স্বামিজী বেদানন্দজী মহারাজ। তৎকালীন 'প্রণব' সম্পাদক। তখন ডিহি শ্রীরামপুরে সাময়িকভাবে সঙ্ঘের অপিস ছিল। কারণ, বালিগঞ্জের আশ্রম তখন তৈরি হচ্ছিল।

পার্থক্য

সাম্পানে উঠতেই মাঝি সতর্ক করে দিল :

—সাধু বাবা, এ যায়গা ভয়ঙ্ক। দিনতুপুরে রাহাজানি হয়, খুনখারাপী হয়। বিশেষ করে ভারতের লোকদের উপর।

স্বামিজী বললেন :

--আমরা তুজন মৌলমিন থেকে এসেছি, যাব ট্র্যাভয়। নদী পার হয়ে বাস ধরতে হবে। তোমার সাম্পানে তাই উঠেছি। তুমিই ভরসা।

—সাধু বাবা, ওপারে গিয়ে বাস ধরতে পারবেন না। দেরী হয়ে গেছে। এদিকে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। তু'চার টাকার জন্য মানুষ খুন করতে এখানকার গুণ্ডারা মনে কিছু করে না। কথায় বলে বার্মা মুল্লুক।

স্বামিজী একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কিন্তু তাঁর আত্মপ্রত্যয় আছে, আর আছেন মাথার উপর শ্রীগুরু মহারাজ।

জিগগেস করলেন :

—আচ্ছা, মাঝি ভাই, ওপারে আজ রাতের মত একটু নিরাপদ আশ্রয় পাওয়া যাবে কি ?

মাঝি একটু ভেবে নিয়ে বললে :

—না, তেমন কোন আশ্রয় পাবার সম্ভাবনা নেই। তবে যদি ইচ্ছা করেন, এই গরীব মাঝির ঘরে রাতটা কষ্ট করে কাটাতে পারেন। তবে আমি কিন্তু মুসলমান।

মাঝির কথার মধ্যে একটা আন্তরিকতার সুর আছে। আর তার কথায় রয়েছে চট্টগ্রামের ভাষার টান। বাঙ্গালী দেখে হয়ত তাই দেশের কথা মনে পড়েছে তার।

অতিথিবৎসল মাঝির ব্যবহারেও স্বামিজী খুশী হয়ে বললেন ঃ

বেশ তো তাই থাকব।

সাম্পানে করে নদী পার হয়ে সন্ন্যাসী দু'জন পায়ে হেটে রওনা হলেন মাঝির সঙ্গে। তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস মাঝি আর যাই করুক, তাদের উপর অত্যাচার করবে না, লুটপাট করবে না।

খানিকটাপথ হেটে এসে তাঁরা পৌছুলেন মাঝির বাড়ীতে। ছোট্ট অতি সাধারণ বাড়ী। ডেরা বললেই হয়। নতুন অতিথি দেখে মাঝির বর্মী স্ত্রী ও ছেলে মেয়েরা বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল, সন্ন্যাসীদের মুখের উপর! ভাবটা এই যে, এমন অদ্ভুত পোশাকের মানুষ তারা আগে আর কখনও দেখেনি। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা অনেকটা ভীত সন্ত্রস্থ হয়ে পালাল।

বর্মী ভাষায় মাঝি তা'র স্ত্রীকে কী যেন বললে। পর্ণ কুটীরের সুমুখে এক ফালি বারান্দা। বারান্দায় একটি বাঁশের মঞ্চ। ঐ মঞ্চটি মাঝির স্ত্রী পরিষ্কার করে দিল। খুবই তৎপরতার সঙ্গে। তারপর মাঝি আঙ্গুলি নির্দেশে মঞ্চটা দেখিয়ে বলল ঃ

—ওখানে আপনাদের কষ্ট করে রাত্রি বাস করতে হবে।

সন্ন্যাসীদ্বয় মঞ্চের কাছে এগিয়ে গেলেন। গৃহস্বামিনী বেশ কিছু খড় বিছিয়ে দিলে মঞ্চের উপর।

বিদেশ বিভুঁয়ে অপরিচিত যায়গায় এ আশ্রয়টুকু সন্ন্যাসীদের কাছে আশাতীত। তা'রা মঞ্চের উপর উঠে ঝোলা থেকে চিড়ে গুড় বার করে রাতের খাওয়া শেষ করলেন।

সেদিন সন্ধ্যায় মঞ্চের উপর বসে সন্ন্যাসীরা লক্ষ্য করলেন মাঝি

স্ত্রী ও পুত্রদের নিয়ে নামাজ পড়ল। পরদিন সকালেও তাঁ'রা অনুরূপ সুন্দর দৃশ্যটি দেখলেন। খুবই প্রীত হলেন সন্ন্যাসীদ্বয়। দরিদ্র হলেও মাঝি ধর্মপ্রাণ। ধর্মীয় আচার নিষ্ঠা পালনে তা'র এতটুকু শৈথিল্য নেই। সে বর্মিনী বিয়ে করে মুসলমান ধর্মকে জলাঞ্জলি দেয়নি। অধিকন্তু আরো দৃঢ়তার সঙ্গে আচরণ পালন করছে। এই বৈশিষ্ট্য মুসলমানদের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায়।

পরদিন সকালে সন্ন্যাসীদ্বয় গৃহস্থ মাঝির কাছে বিদায় নিয়ে রওনা হলেন ট্রাভয়ের উদ্দেশ্যে। যথা সময়ে ট্রাভয়ে পৌঁছে তারা আশ্রয় নিলেন সারদাচরণ দাসের বাড়ীতে। সারদা বাবু একজন পদস্থ সরকারী কর্মচারী।

সন্ন্যাসীদ্বয়কে যথেষ্ট সমাদর করলেন। কথায় কথায় বললেন দাস বাবু, এখানে কয়েকজন ধর্মপ্রাণ হিন্দু ভক্ত আছেন। নিষ্ঠার সঙ্গে ধর্মাচরণ করেন। তা'দের মধ্যে চৌবেজী একজন।

এমনি সময় চৌবেজী সশরীরে এসে হাজির হলেন। তিনি সারদাবাবুর বাড়ীতে দুধ যোগান দেন। দুধ নিয়েই এসেছেন তখন।

সারদাবাবু চৌবেজীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন। সোৎসাহে সন্ন্যাসীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

—এই যে চৌবেজী এসে গেছেন। এরই কথা বলছিলাম। এমন নিষ্ঠাবান হিন্দু এ অঞ্চলে আর দুটি নেই। সব সময় ধর্ম কর্ম নিয়ে থাকেন। সাধু মহারাজদের প্রতি তা'র অগাধ শ্রদ্ধা।

প্রশংসায় বিগলিত হয়ে চৌবেজী সন্ন্যাসীদের উদ্দেশ্য করে বললেন:

—সন্তজী, এ বর্ম্মা মুল্লুকে এসে আর আচার বিচার রইল না। এ মহাম্লেচ্ছের দেশ। তবু যতখানি সম্ভব সদাচার রক্ষা করে

চলছি। অনাচার একদম সহ্য করতে পারিনে। প্রায় এক নিঃশ্বাসেই বলে ফেললেন চৌবেজী। শেষে মিনতি জানালেন :

—দয়া করে একবার গরীবের বাড়ীতে পায়ের ধূলি দেবেন।

শেষে সারদাবাবুর—আন্তরিক সুপারিশে সন্ন্যাসীরা সম্মতি দিলেন। কিন্তু চৌবেজীর তর সয় না। বায়না ধরলেন আজই যেতে হবে। অগত্যা পেড়াপেড়িতে রাজী হতে হল সন্ন্যাসীদের। রওনা হলেন তাঁরা।

চৌবেজী খুব সমাদর করেই বাড়ী নিয়ে এলেন সন্ন্যাসীদ্বয়কে। যথাযোগ্য আপ্যায়ন করে বসালেন তা'র ঘরে। বেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ঘর। হঠাৎ একজন বর্মিনী এসে হাজির হলেন।

স্বামিজী জিজ্ঞেস করলেন, চৌবেজী ইনি কে ?

—ইনি কে ?

—আমার স্ত্রী।

বিস্মিত কণ্ঠে বললেন স্বামিজী :

—এ কি চৌবেজী ? আপনি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ হয়ে বর্মিনী স্ত্রী নিয়ে আছেন।

চৌবেজী এতটুকু লজ্জা সংকোচ বোধ করলেন না। সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষায় জবাব দিলেন :

—ইসমে কেয়া হুয়া ? উসকী রসুই ঘর মে ঘুসনে নেহি দেতা, রসুই মৈ আপনে হাথ সে বানাতা হুঁ। অদূরে দণ্ডায়মান শিশুগুলোকে দেখে স্বামিজী প্রশ্ন করলেন :

—এরা কারা ?

—লড়কা সব উসকী হ্যায়।

হামারা জরু, বালবাচ্চা দেশমে হ্যায়। ঘরমে রুপেয়া ভেজতাহুঁ, খাঁটি হিন্দু ব্রাহ্মণের নিষ্ঠার নমুনা দেখে সন্ন্যাসীরা হতবাক।

এটা কী ধরনের নিষ্ঠা, সদাচার !

সন্ন্যাসীরা মর্ম্মাহত হলেন কিন্তু প্রকাশ্যে তেমন কিছু বললেন না। বিশেষ কাজের তাড়া আছে বলে উঠে পড়লেন।

চৌবেজী মুখে ধর্মবুলি আওড়াতে আওড়াতে খানিকটা পথ এগিয়ে দিলেন সন্ন্যাসীদের।

পথ চলতে চলতে সন্ন্যাসীদের থেকে থেকে মনে পড়তে লাগল সেই নিষ্ঠাবান মাঝির কথা। একই দেশে হিন্দু মুসলমান দু'টি পরিবারের মধ্যে কী অদ্ভুত পার্থক্য। উভয়েই সুন্দরী বর্মিনীর পাণি গ্রহণ করে ঘর সংসার করছে। একজন স্ত্রীকে নিজের মুসলমান ধর্মে, নিজেদের সমাজে রূপান্তর করেছেন। আর একজন হিন্দু ব্রাহ্মণ বর্মিনীর সঙ্গে ঘর সংসার, সহবাস করে নিষ্টাবান হিন্দুর ভড়ং করছে।

এই দু' শ্রেণীর লোকের মধ্যে একটা বিরাট ধর্ম নিষ্ঠার পার্থক্য প্রায়ই চোখে পড়ে। মুসলমান যেখানেই যাক না কেন, যাকেই বিয়ে করুক না কেন, নিজের ধর্মকে সে আঁকড়ে থাকে, পালন করে !

আর হিন্দু ?

একটা চাপা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে স্বামিজীর মুখ থেকে। *

* ১৯৩৭ সালের মে মাসে স্বামী বিকাশানন্দ ও আত্মস্বরূপানন্দজী বর্মা দেশে প্রচারের কাজে যান। এবং উক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন।

মড়ার সঙ্গে জ্যান্ত দে

কোথাও আশ্রয় না পেয়ে শেষে সন্ন্যাসীরা আশ্রয় নিলেন শ্মশানের একটা ঘরে। কিন্তু ওখানেও শান্তি নেই। নেশায় উন্মত্ত চারজন রক্ত-চক্ষু লোক ঘরের কাছে এসে চেঁচিয়ে উঠল :

এরা সব কারা ? এ যে দেখছি জ্যান্ত মানুষ।

একজন সোল্লাসে চেঁচিয়ে বলল :

—দে মরার সঙ্গে জ্যান্তদের চড়িয়ে। বলেই কয়েক পা এগিয়ে এল লোকটি।

সন্ন্যাসীরা প্রমাদ গণলেন। মাতাল নেশার ঘোরে অথবা বাচালতা করে যদি একটা কিছু করে বসে! জোর করে ধরে টেনে নিয়ে যায় জ্বলন্ত চুল্লীর দিকে!

কে রক্ষা করবে এ নির্জন শ্মশান পুরীতে?

মনে মনে জপতে লাগলেন সন্ন্যাসীরা গুরু মহারাজের নাম।

পরক্ষণেই মাতালগুলো নাচতে শুরু করল, কেউ কেউ গান ধরল মাঝে মাঝে সমস্বরে বলে উঠল :

বল হরি, হরি বল।

শবযাত্রীর সংখ্যা জন পনের হবে। সকলেই বলিষ্ঠ। কম বেশী নেশা প্রত্যেকেই করেছে, বোধ হয় নেশা ভাঙের সর্তেই রাত্রি দ্বিপ্রহরে মড়া পোড়াতে এনেছে বহুদূর থেকে।

সন্ন্যাসীরা দিনে ভিক্ষা করে যে অর্থ ও জিনিসপত্র পেয়েছেন সবই সঙ্গে রয়েছে। জিনিসপত্র ঘরে এক কোণে জড় করা আছে আর টাকা রয়েছে দলপতি সন্ন্যাসীর কাছে। যদি মাতালগুলো

আক্রমণ করে বসে? স্বামিজী দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, আত্মরক্ষার চেষ্টা করতেই হবে। কিন্তু তাদের আপসে শান্ত করার চেষ্টাই শ্রেয়ঃ।

আর যদি তারা শান্ত না হয়? উগ্র হয়ে ওঠে?

হঠাৎ ওঠে দাঁড়ালেন সঙ্ঘের গায়ক রমণী সরকার। মাতালদের কাছে গিয়ে বললেন ঃ

—আমরা ধর্ম প্রচারে ও দেশের সেবার বেরিয়েছি। এই শ্মশানে আশ্রয় নিয়েছি স্থানীয় পৌর সংস্থার অনুমতি নিয়ে। স্বামিজীও বেরিয়ে এলেন রমণী বাবুর সঙ্গে। সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দৃঢ় কণ্ঠে বললেন ঃ

—আমরা সন্ন্যাসী। কারো অনিষ্ট করিনে। আমাদের নিশ্চিন্তে থাকতে দিন। ভোরেই আবার প্রচার কাজে বেরুতে হবে।

স্বামিজীর কথায় হঠাৎ যেন তাদের সম্বিত ফিরে এল। উদ্যত সাপের ফণা ওঝার মন্ত্রে যেন নেমে গেল। উগ্র উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবটা মুহূর্তের মধ্যে বদলে গেল। স্বামিজীর দিকে তাকাবার সাহস যেন হারিয়ে ফেলেছে তারা। বিনা প্রতিবাদে তারা ধীরে ধীরে সরে গেল চিতার কাছে। হঠাৎ আচরণের পরিবর্তন দেখে অবাক হলেন অন্যান্য সন্ন্যাসীরা। কিন্তু আস্তে আস্তে তারা সরে গেল চিতার কাছে।

স্বামিজী ও রমণী বাবু ঘরে ঢুকলেন। কিন্তু বাকী রাত কেউ চোখ বুজতে পারলেন না। বাইরে দাউ দাউ করে জ্বলছে চিতার আগুন। তার প্রচণ্ড তাপ ও হল্কা এসে লাগছে জানালাহীন ঘরে। রমণী বাবুর সন্দেহ মাতালরা আবার হামলা করবে।

স্বামিজী বসে বসে ভাবছেন।

কী আশ্চর্য! শ্মশানে এসেও মানুষের এই চণ্ডালবৃত্তি কী করে দেখা দেয়! একটা মানুষ জ্বলে পুড়ে ভস্মে পরিণত হয়, আর একজন

এ সব দেখেও পৈশাচিক ব্যবহার করে। উন্মত্তের মত যা' তা' বকে, মারধোর করে। বাড়ীতে আশ্রয় পাওয়া দূরের কথা! শ্মশানে এসেও নিস্তার নেই। কিন্তু স্বামিজী জানেন, হতভাগ্য মাতাল-গুলো দিনের আলোতে এমন অশালীন ব্যবহার করবে না। তারা তখন হয়ত সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি। অথচ রাত্রের অন্ধকারে তারা শ্মশানের পিশাচ।

সত্যিই তাই হল। পরদিন শ্মশান কমিটির সম্পাদকের কানে গত রাত্রের উৎপাতের কথা যেতেই তিনি তলব করলেন শববাহীদের। তাদের কেউ কেউ এসে অনুতপ্ত হয়ে মাপ চাইল। হাত জোর করে বললো:

স্বামিজী, আমাদের ক্ষমা করুন। তখন আমরা মানুষ ছিলাম না। নেশার ঘোরে কী অপরাধ করেছি, কিছুই মনে নেই।

স্বামিজী তাঁদের আশীর্বাদ করে বললেন:

—সুমতি হোক।

---

* ১৯৩৮ সাল। আত্মস্বরূপানন্দজীর তত্ত্বাবধানে কয়েকজন সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও স্বেচ্ছাসেবক প্রচারে যান। আটপুর স্টেশনে নেমে চারণদল সারাদিন দারুণ গ্রীষ্মে কাজ করেন। কোথাও আশ্রয় না পেয়ে শ্মশানে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

রক্ত খিচ-লেঙ্গে

সঙ্ঘ সন্ন্যাসী ঘরে ঢুকে দেখলেন, এক বিরাট জটাজুটধারী বিশাল বপু তান্ত্রিক বসে আছেন। পরনে তাঁর রক্ত বসন, কপালে রক্ত-তিলক। চোখ দুটো ভাটার মত। উপস্থিত গৃহী ভক্তদের হাতে ফল প্রসাদ দিচ্ছেন। হঠাৎ সন্ন্যাসীকে দেখেই অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকালেন।

গৃহস্বামী সন্ন্যাসীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন মহাক্ষমতাশালী তান্ত্রিকের।

—ইনি এ তল্লাটের একজন বিখ্যাত তান্ত্রিক। বছরে দু' একবার আমার গৃহে দয়া করে পদার্পণ করেন। কৃপা করেন। অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী।

সন্ন্যাসী লক্ষ্য করলেন তান্ত্রিকের আপাদমস্তক, আচরণ।

গৃহকর্তা সন্ন্যাসীর দিকে তাকিয়ে পরিচয় দিলেন, বললেন :

ইনি ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সম্পাদক। মহাজ্ঞানী পণ্ডিত সাধু মহারাজ। আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য এখানে আমন্ত্রণ করে এনেছি।

তান্ত্রিক তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে একবার স্বামিজীর দিকে তাকিয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন :

—ও সঙ্ঘ তো কোন কাজ করে না। ফালতু।

সিংহ পুরুষ সন্ন্যাসী বিরক্তি ভাব কোন রকমে দমন করে তান্ত্রিককে প্রশ্ন করলেন :

—আপনি সঙ্ঘের কোন সন্ন্যাসীকে জানেন? কোন কর্মকেন্দ্র দেখেছেন?

—না।

—সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতার নাম জানেন?

—না।

—সঙ্ঘের কোন পুস্তাকাদি পড়েছেন?

—না।

সিংহ পুরুষ এবার গর্জে উঠলেন। হুংকার দিয়ে বললেন:

—সঙ্ঘের কিছুই খোঁজ খবর রাখ না, জান না, এবং না জেনে শুনেই বলে দিলে ওরা কিছুই করছে না! এতবড় মূর্খ তুমি।

উপস্থিত ভক্তগণ স্বামিজীর কথা সমর্থন করলেন মনে মনে কিন্তু সাহস করে মুখে কিছু বলতে পারলেন না। পাছে তান্ত্রিক যদি তাঁদের ভস্ম করে ফেলে। তান্ত্রিকের অসাধ্য কিছুই নেই।

স্বামিজীর রূঢ় মন্তব্যে অপমান বোধ করলেন তান্ত্রিক। তিনি শৌর্য বীর্যপূর্ণ হিন্দুস্থানী তান্ত্রিক। হেলা-ফেলা নয়! এ পল্লীর সবাই তাকে মানে, সম্মান করে। আর ত'াদের সুমুখেই কিনা এক ক্ষুদ্রকায় সন্ন্যাসী অপমানজনক কথা বললেন।

অসহ্য। তান্ত্রিকের আত্মাভিমানে ঘা পড়ল। ভক্তদের কাছে কিছুতেই হার স্বীকার করা চলে না।

তা স্বীকার করলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার। তাই তান্ত্রিক ভয়ঙ্কর রুদ্র মূর্তি ধরে হিংস্র বাঘের মত স্বামিজীকে আক্রমণে উদ্যত হলো। চেঁচিয়ে অসুরের মত গর্জন করে উঠল।

—তিন রোজমে তুমহারা খুন খিচ লেঙ্গে। তারপর চোখ পাকিয়ে জটা-সামলে, বদ্ধ মুষ্ঠিতে তান্ত্রিক, এগিয়ে এলেনে সন্ন্যাসীর দিকে।

এ অবাঞ্ছিত পরিবেশের মধ্যে ভক্ত গৃহস্থরা ভীত ও সন্ত্রস্ত। অথচ কাউকে বারণ করতে পারছেন না। একে বললে উনি রাগ করবেন, অসন্তুষ্ট হবেন। মহা সমস্যায় পড়লেন তারা।

স্বামিজী প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝেছিলেন। তান্ত্রিক একটি কাগজের বাঘ তুল্য। অথচ গৃহস্থদের ভাওতা দিয়ে সেবা আদর করছে। সেই কাগজের বাঘকে সায়েস্তা করতে তিনিও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, কয়েক পা এগিয়ে এসে সরোষে তিনি চেঁচিয়ে বলে উঠলেন :

—তোম তিন রোজ মে হামারা খুন খিচ লেঙ্গে, লেকিন হাম অভি তুমহারা খুন খিচ লেঙ্গে।

বলেই তেজস্বী স্বামিজী—তান্ত্রিকের উপর প্রায় লাফিয়ে পড়বার উপক্রম করলেন। তান্ত্রিক বেগতিক দেখে উঠে দৌড়ে পালিয়ে গেলো। কাণ্ডটা দেখে অনেকেই হেসে ফেললেন। তারা ভাবতেও পারেননি তান্ত্রিক এমনি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পালাবে।

বিব্রত গৃহস্বামী অনুতাপের কণ্ঠে বললেন :

—কি করব স্বামিজী! এ তান্ত্রিকটি প্রায়ই এখানে আসেন। নিজের তন্ত্রশক্তির উদাহরণ দিয়ে আমাদের তাক লাগিয়ে দেয়। কী ভয়ংকর সে-সব কথা। তাই আমরা তার ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত। কাজেই তুষ্ট করার জন্য তাঁকে ফল ফুল ও নগদ দক্ষিণা দিয়ে বিদেয় দিই প্রতিবার।

শুনে স্বামিজী না হেসে থাকতে পারলেন না। বললেন :

—এ সব ভবঘুরে ভণ্ডকে এতটুকু আশ্রয় প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়, এ সম্প্রদায়ের কেউ কেউ অলৌকিক শক্তির পরিচয় দেখাবার চেষ্টা করে কিন্তু এতটুকু আধ্যাত্মিক ধ্যান ধারণা নেই। খোঁজ করলে দেখবে হয়ত সঙ্গে ভৈরবী টৈরভী আছে। এরা ছদ্মবেশী শয়তান।

স্বামিজীর কথা পরখ করে দেখার জন্য কারো কারো মনে একটা কৌতুহল জাগলো।

প্রশ্নকারীদের অনেকেই কৌতুকবোধ করলেন। ঔৎসুক্য মেটাবার জন্য প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেলেন। উদ্দেশ্য, তান্ত্রিকের সঙ্গে

সত্যিই ভৈরবী আছেন কিনা অথবা সে শ্রেণীর অন্য কেউ। গৃহস্বামীও গেলেন। খানিকটা দূর যেতেই তাঁদের চোখে পড়ল, তান্ত্রিক একটা বট গাছের নীচে উপবিষ্ঠা এক ভৈরবীর সঙ্গে চাপা কণ্ঠে কী যেন বলছেন। তারপর উৎসাহী ভক্তদের এ দিকে ছুটে আসতে দেখেই তান্ত্রিক ও ভৈরবী চিমটে কমণ্ডলু ও পুটুলি উঠিয়ে নিয়ে ছুট দিল।

তান্ত্রিক ভৈরবীকে নিয়ে পালিয়ে বাঁচলেন। এই দৃশ্যটা দেখে যুবকরা প্রচুর আনন্দ উপভোগ করেছিল, বলেছিল:

—স্বামিজী আপনার অনুমান মিথ্যা নয়। সেই তান্ত্রিকের সঙ্গে এক ভৈরবী রয়েছে! দু'জন একসঙ্গে ঊর্ধশ্বাসে ছুটে পালিয়েছে শুনে উপস্থিত সকলেই সশব্দে হেসে ওঠলেন।

—

এই স্বামিজী হলেন সঙ্ঘের প্রাক্তন সহ সভাপতি শ্রীশ্রীবেদানন্দজী মহারাজ।*

কঃ সাধু

সিমলার নীচেই ছোট্ট পাহাড়ী শহর সেলিন। সন্ন্যাসীরা ঘুরতে ঘুরতে এলেন এখানে। অপরিচিত শহর। প্রচণ্ড শীত। হাত পা জমে যাচ্ছে। কিন্তু একটা নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে বার করতেই হবে। মাথা গুজবার মত যায়গা না পেলে কী করে প্রচারের কাজ এগুবে? কিন্তু আশ্রয় কে দেবে? সব যায়গায় বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসতে হচ্ছে। কিন্তু নিরাশ হলে চলবে না। পথচারীদের তাঁরা জিগগেস করলেন, এদিকে কোথাও আশ্রয় পাবার সম্ভাবনা আছে কিনা?

একজন বললেন:

—স্বামিজী এ শহরে একজন দেশীয় রাজ্যের রাজা আছেন। তিনি বড় ভক্ত এবং সাধু সন্ন্যাসীর খুব সেবা করেন। আমার বিশ্বাস, তাঁর সঙ্গে দেখা করলে নিশ্চয়ই আশ্রয় পাবেন।

অন্ধকারে যেন আলোর সন্ধান পেলেন সন্ন্যাসীরা। রাজা যদি আশ্রয় দেন তা হলে কথাই নেই। সুষ্ঠু ভাবে প্রচারের কাজ করা যাবে। তা'ছাড়া নিরাপত্তার দিক দিয়েও নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে।

স্বামিজী পথচারির নির্দেশমত সদলে রওনা হলেন রাজ দর্শনে। ভাবলেন, এও এক সমস্যা। রাজ দর্শন সাধারণতঃ দুর্লভ ব্যাপার। দৌবারিক, পারিষদ ও রাজ কর্মচারি, এই তিন ব্যূহ অতিক্রম করে রাজ দর্শন পাওয়া যায়। তবু আত্ম প্রত্যয়ের সঙ্গে এগিয়ে চললেন সন্ন্যাসীগণ। কিন্তু রাজদ্বারে গিয়ে দেখলেন, প্রবেশের কড়াকড়ি নেই। দারোয়ানের হাতে শ্লিপ দিতেই খানিকক্ষণ পর রাজা স্বয়ং

নীচে নেমে এলেন। সাদর সম্ভাষণ করে আন্তরিক সমাদর জানালেন, বললেন :

—বেশ যতদিন খুশী আপনারা এখানে থাকুন। আহার ও বাসস্থানের এতটুকু অসুবিধে হবে না। আমি এখনই আদেশ দিচ্ছি বন্দোবস্ত করার জন্য। সঙ্গে সঙ্গে রাজা পার্শ্বস্থ একজন কর্মচারীকে নির্দেশ দিলেন :

—সন্ন্যাসীদের থাকা খাওয়ায় বন্দোবস্ত করে দাও।

প্রচণ্ড শীতে আর্ত সন্ন্যাসীরা আশ্রয় পেয়ে স্বস্তি বোধ করলেন। এ অনেকটা মেঘ না চাইতে জল পাওয়ার মত।

ধর্মপ্রাণ রাজা আরো বললেন :

—আপনারা নিঃসঙ্কোচে আপনাদের রুচি অনুযায়ী আহারের ফরমাশ করতে পারেন।

উত্তরে সন্ন্যাসীরা জানালেন :

—আমরা অনাড়ম্বর জীবন যাপনে অভ্যস্ত। মোটা ডাল ভাত হলেই চলবে।

—তা কি করে হয়? আপনাদের রান্না বান্না ও দেখাশোনার জন্য পাচক ব্রাহ্মণ ও একজন পরিচারক থাকবে। কোন অসুবিধে হলেই আমাকে জানাবেন। সংকোচ করবেন না।

সন্ন্যাসীরা খুব খুশী হলেন। রাজার সমৃদ্ধি ও মঙ্গল কামনা করলেন। এমন একজন নিরভিমান সরল-সহজ রাজার কথা ভাবতেও পারেন নি তাঁরা।

নির্দিষ্ট ঘরে সন্ন্যাসীরা আশ্রয় পেলেন। চমৎকার সুরক্ষিত ঘর। পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। দেয়ালগুলো পুরু। শীত ও দুষ্ট লোকের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট মজবুত।

হাত মুখ ধোবার জন্য গরম জল এল। ওদিকে প্রচুর খাবার তৈরির উদ্যোগ হচ্ছে। রাধুনী ব্রাহ্মণ এসে জিজ্ঞেস করল :

—মহারাজ, কোন বিশেষ রান্নার ফরমাশ আছে কি?

স্বামিজী বললেন :

—না, সাধারণ ডাল ভাত বা রুটি হলেই হবে।

রান্না বান্না শেষ হতে বেশী দেরী হবে না। ঘণ্টাটাক পরেই আহারের জন্য ডাক পড়বে। ততক্ষণে সন্ন্যাসীরা হাত মুখ ধুয়ে নিয়ে গুরু মহারাজের আসন পাতলেন। নিত্য পূজা অর্চনা শেষ করে নিলেন। নিয়মের এতটুকু ব্যতিক্রম হল না।

খানিকক্ষণ পর রাজা এসে আবার দর্শন দিলেন।

—কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো?

—না! আপনি ব্যস্ত হবেন না। প্রয়োজন হলে আমরা আপনার লোকদের জানাব। আমরা পরম আরামে ও নিশ্চিন্ত আছি।

রাজা শুনে প্রসন্ন হলেন।

ফিরে যাবার সময় হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালেন।

—আসল কথাটাই জিগগেস করা হয় নি। আপনাদের কতখানি সুলফা লাগবে?

সুলফা! সে আবার কি?

সন্ন্যাসীরা ভেবে পেলেন না এ জিনিষটা আবার কী?

কাকে বলে সুলফা! একি ভোগ্যপকরণ না দক্ষিণা? শব্দটি বাঙ্গালী সন্ন্যাসীদের কাছে অপরিচিত। কাজেই সন্ন্যাসীরা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন রাজার মুখের দিকে।

রাজা অবস্থাটা বুঝে নিয়ে সাহাস্যে বললেন :

—সাধু মহন্তদের ঐ জিনিষটি না হলে চলে না। একেবারে

অপরিহার্য। আমি কয়েকটি কল্কে সহ সুলফা পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনারা নিশ্চিন্তে সেবা করুন। কেউ বিরক্ত করবেনা।

সন্ন্যাসীরা এতক্ষণে বুঝতে পারলেন সুলফা জিনিষটা কি? গঞ্জিকারই সহোদর বা এমনি কোন জিনিষ হবে। বিনীতভাবে দলপতি স্বামিজী জানালেন ঃ

—আমরা ওসব খাইনে। আমাদের সঙ্ঘের ও-জিনিষ স্পর্শ করা নিষেধ।

শুনে রাজা যেন আকাশ থেকে পড়লেন। চোখ দুটো কপালে তুলে বললেন ঃ

—বলেন কি? এ সেবন ছাড়া বাহ্য জগৎ ভোলবার আর কোন উপায় নেই। কসে দম চড়াতে পারলেই কুণ্ডলিকৃত ধূম্র প্রসাদের আমেজে একেবারে ব্যোম-ভোলানাথ। সঙ্গে সঙ্গে বাহ্য জগত থেকে তুরীয় লোকে সমুন্নতি।

—আমরা কোন রকম মাদক দ্রব্য স্পর্শ করিনে। ক্ষমা করবেন।

রাজা অবাক হয়ে গেলেন সঙ্ঘ সন্ন্যাসীর কথা শুনে। এ রকম ব্যতিক্রম আজ পর্যন্ত রাজার চোখে আর পড়েনি। কত সাধু সন্তকে তিনি এর আগে আশ্রয় দিয়েছেন, তাদের সকলেই সর্বাগ্রে সুলফার ফরমাশ করেছেন। অথচ এরা…… ?

স্বামিজী বললেন ঃ

—আমরা বিলাস ও নেশাহীন জীবন যাপন করি। পরমাত্মার ধ্যান উপাসনা ও সনাতন ধর্মের প্রচার করাই আমাদের কাজ। তা' ছাড়া আর্তের সেবা, তীর্থ সংস্কার ইত্যাদি। আমাদের আদর্শ "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ।"

স্বামিজীর কথা রাজার কানে গেল কি না বোঝা গেল না। তিনি হঠাৎ উগ্র ভাবে বলে ওঠলেন ঃ

—যিনি গঞ্জিকা সেবা করেন না তিনি সাধুই নন।

সঙ্গে সঙ্গে তার চোখে মুখে একটা তীব্র বিতৃষ্ণার ভাব ফুটে ওঠল, চক্ষু দুটি রক্তবর্ণ হয়ে ওঠল।

সন্ন্যাসীরা রাজার এই পরিবর্তন দেকে হতবাক হয়ে গেলেন। এ কি রকম সাধু-সেবা! সাধুর কী অদ্ভুত সংগা?

সন্ন্যাসীদের দিকে তাকিয়ে রাজা ক্ষিপ্তের মত গর্জে উঠলেন ঃ

—বেরিয়ে যান এখান থেকে। আপনারা সাধু নন। এখানে আশ্রয় মিলবে না।

সাধুদের সম্বন্ধে এরকম উদ্ভট, হাস্যকর ও অবান্তর ধারণা কোন পদস্থ মানুষের থাকতে পারে-এ কল্পনাও করতে পারেন নি সন্ন্যাসীরা। অগত্যা, ছড়ানো-জিনিষ পত্র গুলো গুছিয়ে নিয়ে শীতের অন্ধকারে তাঁরা আবার অনির্দিষ্টের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।*

ঘটনা—১৩৩৮ সাল। স্বামিজী বিকাশানন্দজী প্রচার দলের অধিনায়ক ছিলেন।*

অভিনব

ভদ্রলোক স্বামিজীকে প্রণাম করে নিবেদন জানলেন :

—আমার নাম শ্রীবিধু ভূষণ পাল রায়। চন্দনপুরের অধিবাসী। একটি অভিলাষ নিয়ে এসেছি।

মধুর হাসি হেসে স্বামিজী বললেন :

—বেশ বলুন। সংকোচের কোন কারণ নেই।

—আমাদের গ্রামের লোকদের একান্ত ইচ্ছা একদিন চন্দনপুরে পদার্পণ করে আপনারা যজ্ঞানুষ্ঠান করুন। তাই তাদের হয়ে এসেছি অনুরোধ জানাতে। আশা করি এই সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করবেন না।

স্বামিজী একটু ভেবে নিয়ে বললেন :

—বেশ তো একটা দিন তারিখ, সময় ও যায়গা স্থির করে জানাবেন। বিনীত ভাবে জানালেন ভদ্রলোক :

—আমরা এ সব স্থির করেই এসেছি। গ্রামের মাঝে একটি বড় মাঠ আছে। সেখানেই আজ বিকেলেই যাগযজ্ঞ হতে পারে। আমরা ফর্দ করে ফেলেছি যাগযজ্ঞ ও পূজার আয়োজনের।

ভক্ত বিধুবাবুর আন্তরিক আগ্রহ দেখে খুশী হলেন সন্ন্যাসীগণ। দলপতি স্বামিজী মিষ্টি মধুর হেসে সম্মতি দিলেন।

—বেশ আপনাদের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। আজ বিকেলেই আমরা যাব। ততক্ষণে আপনারা যজ্ঞের ও পূজার সব যোগাড় করে ফেলুন।

বিধুবাবু খুশী হয়ে ফিরে গেলেন। মুখে মুখে যাগযজ্ঞের খবরটা

ছড়িয়ে পড়ল গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। অনেকের মনেই আশা ও উদ্দীপনা দেখা দিল। বহুআকাঙ্খিত একটা বিরাট হোম ও পূজা হবে।

দুপুরে কয়েকজন গ্রামবাসী এসে স্বামিজীকে একটা গোপন সংবাদ দিলেন।

—স্বামিজী, গ্রামের মুসলমানরা বলছেন, যজ্ঞ করতে দেবেন না। তা সত্ত্বেও যদি যাগ যজ্ঞ করা হয়, তবে সব পণ্ড করে দেবেন তারা।

স্বামিজী দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। বজ্র কণ্ঠে তিনি দণ্ডী হাতে নিয়ে বললেন :

—আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। অভয় দিচ্ছি। আমাদের দেহে প্রাণ থাকতে কেউ কোন অনিষ্ট করতে পারবে না। যার সাহস থাকে, এগিয়ে আসুক, পণ্ড করুক যাগযজ্ঞ, পূজা। যান, গিয়ে বলুন সবাইকে।

গ্রামের নির্দিষ্ট বিশাল মাঠে এবং নির্দিষ্ট সময় যজ্ঞের আয়োজন হল। গ্রামের লোকেরা দলে দলে এসে যোগদান করল। দেখতে দেখতে প্রায় দশ হাজার নরনারী যজ্ঞ ক্ষেত্রে এসে জমায়েত হল। বিরাট মাঠে যেন তিল ধারণের যায়গা রইল না।

পূর্ণোদ্যমে ও যথানিয়মে শুরু হল যজ্ঞ। পরিত্যক্ত উন্মুক্ত প্রান্তর বিকালে জনমুখর হয়ে উঠল। অসংখ্য নরনারী সন্ন্যাসীদের সঙ্গে যজ্ঞমন্ত্র উচ্চারণ করল, যজ্ঞে আহুতি দিল। তৃপ্ত মনে বাড়ী ফিরে গেল সবাই। ভক্ত নরনারীর মনে যেন আনন্দ আর ধরে না।

পরদিন সকালে সঙ্ঘ সন্তানগণ গ্রামান্তরের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন প্রচার কাজের জন্য। খানিকটা পথ এগিয়ে যেতেই একদল মুসলমান এসে তাঁদের ঘিরে ফেলল।

সন্ন্যাসীরা ভাবলেন, গতকাল গ্রামের ওই ভদ্রলোকদের ইঙ্গিত অগ্রাহ্য করার ফল। নিশ্চয়ই মুসলমানরা অসন্তুষ্ট হয়ে আক্রমণ বা

অপমান করতে এসেছে। এই আশঙ্কা গ্রামবাসীদের অনেকের মনেই ছিল।

কিন্তু সঙ্ঘ-সন্তানগণ স্থির ধীর ভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে মুসলমানদের উদ্দেশ্য করে স্বামিজী মহারাজ জিজ্ঞেস করলেন :

—আপনাদের কী চাই বলুন ?

—স্বামিজীর প্রশ্নের উত্তরে দু'জন মুসলমান গৃহস্থ এগিয়ে এলেন। সাগ্রহে বললেন :

—সাধু, তোমগো আজ যাইতে দিমুনা। আর একটা দিন থাইকা। আবার যজ্ঞ করতে হইব। যা' খরচ পত্তর লাগে আমরা দিমু।

গ্রাম্য মুসলমানদের প্রস্তাবটি অতি সাধারণ, স্বাভাবিক ও সুন্দর। তবুও স্বামিজী একটি খোঁচা না দিয়ে থাকতে পারলেন না।

আপনারা না বলছিলেন সভাপণ্ড করে দেবেন। হঠাৎ আবার যজ্ঞ করার প্রস্তাব এলো কী করে ? ব্যাপার কী ?

অতি বিনীত ভাবে মুসলমানদের একজন প্রতিনিধি বললেন :

—যজ্ঞের যে এমন সুফল হয় আমরা জানতাম না। খরায় মাঠ ঘাট শুকাইয়া মইরা যাইতেছে। জলের অভাবে আমরা মইরা যাইতাছি। কিন্তু দেখলাম, কাল বিকালে যজ্ঞ হওয়ায় পরই তুমুল বৃষ্টি হইল। আমাদের ফসল বাঁচল, আমরাও বাঁচলাম। বলেই একটু ইতস্তত করতে লাগলেন তারা।

সহাস্যে প্রশ্ন করলেন স্বামিজী :

— আরো কিছু বলার আছে নাকি ?

একটু ভেবে নিয়ে বললেন একজন মুসলমান :

—যজ্ঞের ভাল দিকটা গাঁয়ের হিন্দুরা আমাদের বলেনি। তারা বলছিল, তোমরা আইছ আমাদের মধ্যে কাইজা ঝগড়া লাগাইতে।

—আপনারা সব ভুল শুনেছেন। এসব হচ্ছে দুষ্ট, মতলব—বাজ লোকের কারসাজি।

দ্বিতীয় মুসলমানটি সাগ্রহে বললেন ঃ

—আমাগো পক্ষ থাইক্যা আর একটা যজ্ঞ করেন মহারাজ! পূরা খরচা আমরা দিমু।

উত্তরে স্বামিজী সহাস্যে বললেন ঃ

—আলাদা যজ্ঞের প্রয়োজন নেই। বর্ষা বৃষ্টি হলে হিন্দু-মুসলমান দুই জল পাবে। চাষের জমি ভাল হবে। বিশ্বাস হচ্ছে না?

মাথা নেড়ে জানালেন একজন মুসলমান ঃ

—সত্যই আমার বিশ্বাস হছে না।

স্বামিজী আবার হেসে বললেন ঃ

—একই সূর্য সমপরিমানে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলকে আলোদান করেন। আমাদের ভগবান আর আপনাদের আল্লা আলাদা নন। দু-ই এক। কাজেই তার কৃপা সবাই পাবেন।

খুশী হয়ে ফিরে গেলেন মুসলমানগণ।

---

* ১৯২১ সাল। স্বামী বিকাশানন্দজীর পরিচালনায় প্রচার দলটি ময়মনসিং এর বাজিতপুর গ্রামে যান। সেখানে উক্ত ঘটনাটি ঘটে।

তর্ক যুদ্ধ

বাণী গ্রামের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা ঠিক করলেন সন্ন্যাসীদের প্রভাব খর্ব করতেই হবে। তাদের আশঙ্কা সন্ন্যাসীরা এসেচেন সর্বধর্ম সমন্বয় প্রচার করতে। প্রচারের নাম করে সমাজে অনাচার প্রতিষ্ঠা করতে। মুচি মেথর, ব্রাহ্মণ-কায়েতকে এক হুঁকো এক কল্কে ধরাতে। মুচি মেথরের সঙ্গে ব্রাহ্মণ-কায়েত কে কোলাকুলি করাতে অর্থাৎ জাত ধর্ম খুইয়ে হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব লোপ করার জন্য।

—না, না, তা' হতে দেওয়া হবে না। কিছুতেই নয়।

অনেক ভেবে চিন্তে প্রাজ্ঞ ব্রাহ্মণরা প্রস্তাব দিলেন সন্ন্যাসীদের শাস্ত্রবিচারে আহ্বান করা হোক। সন্ন্যাসীরা সমাজসেবক হলেও শাস্ত্রজ্ঞ নন। কাজেই তর্ক যুদ্ধে তাঁদের পরাজিত করতে বেগ পেতে হবে না! ফলে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতে তারা পথ খুঁজে পাবেন না।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের এই প্রস্তাবটা গ্রামের প্রায় সবাই মেনে নিল। স্থির হল, সভাশেষে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ সন্ন্যাসীদের দলপতিকে তর্ক যুদ্ধে আহবান করবেন এবং গ্রামবাসীদের সুমুখেই। তর্কে পরাস্ত করে বুঝিয়ে দেবেন যে সন্ন্যাসীরা শাস্ত্রজ্ঞ নন। এবং গ্রামের পণ্ডিতদের তুলনায় জ্ঞানবুদ্ধিতে তারা নিতান্ত নাবালক।

স্বামিজী জানেন, বাণীগ্রাম ময়মনসিং জেলার একটি ব্রাহ্মণ কায়স্থ পরিপূর্ণ বর্ধিষ্ণু গ্রাম। এবং ব্রাহ্মণদের পাণ্ডিত্যের ভড়ংএর কথাও কিছু কিছু তাঁর কানে এসেছে।

সভাশেষে স্বামিজী একটা প্রশ্ন তুলে ধরলেন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ব্রাহ্মণদের কাছেঃ

—আপনারা বলুন, ক্ষয়িষ্ণু, দুর্বল, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন, নিপীড়িত, ধর্ম

চেতনাহীন হিন্দুজাতির সংগঠন ও ঐক্যের প্রকৃষ্ট পথ কী? এই জাতীয় সমস্যার সমাধান কোন পথে? আমাদের ধর্ম ও জাতিকে বাঁচাবার উপায় কী বলুন?

গ্রামের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ভেবেছিলেন স্বামিজীকে কঠিন প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে তুলবেন। সকলের সুমুখে তাঁকে তর্ক যুদ্ধে হারিয়ে বাহবা কুড়াবেন। কিন্তু অভাবিত প্রশ্নটা তুলে স্বামিজী তাদের উল্টে বিপদে ফেললেন। তারা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন।

সঠিক উত্তর কারো মুখে যোগাচ্ছেনা। তাদের চিন্তিত ও ভাবিত দেখে স্বামিজী আবার বললেন:

—তর্ক করা সহজ, কূট প্রশ্ন করে সেবাব্রতী সন্ন্যাসীদের জব্দ করাও কঠিন নয়। কিন্তু জাতীয় জীবনের বাস্তব সমস্যা সমাধান করা এত সহজ নয়।

প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে কতক্ষণ আর চুপ করে থাকা যায়?

ভট্টচার্য মশাই তর্কাচার্যকে উদ্দেশ করে বললেন:

—কি হে তর্কাচার্য, বলনা কি বলবে? স্বামিজী তো প্রশ্ন করেছেন।

একটু ইতস্ততঃ করে তর্কাচার্য বললেন:

—ভট্টাচার্য, যা বলবার তুমিই বল।

আমার কিছু বলার নেই।

বিদ্রূপের সুরে বলে ওঠলেন ভট্টাচার্যি মশাই:

—সে কি হে, তুমি যে বড় লম্বালম্বা কথা বলে শাস্ত্র আওড়াতে আওড়াতে এসেছিলে, এখন মুখ বুজে আছ কেন? পাণ্ডিত্য দেখাও।

—দর্প কি আমি একাই করেছি হে ভটচার্য? তোমরা সবাই মিলে স্বামিজীকে জব্দ করার জন্য ওঠে পড়ে লেগেছিলে। আমাকে তাতিয়ে নিয়ে এসেছ। এখন এগিয়ে এসে জবাব দাও না কেন?

স্বামিজী বিনীত ভাবে সাদর আহ্বান জানালেন :

—আপনাদের মধ্যে বহু প্রাজ্ঞ ব্যক্তি রয়েছেন, আলোচ্য বিষয়ে কিছু বললে খুশী হব। এতে হার জিতের কোন প্রশ্ন নেই।

কিন্তু স্বামিজীর এ আহ্বানে কেউ সাড়া দিল না। অগত্যা স্বামিজী নিজেই বললেন, আপনারা যখন কেউ কিছু বলছেন না, তখন আমিই বলি :

—"স্থিতোহস্মি গত সন্দেহঃ।"

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মধ্যে একটা অস্ফুট গুঞ্জন শুরু হল। কানা-কানি হাঁকাহাকিও চলল বেশ খানিকক্ষণ। কিন্তু তর্ক যুদ্ধে কেউ এগিয়ে এলেন না। সভায় আসবার আগে যে ক'জন গর্বিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পাণ্ডিত্য জাহির করছিলেন, তারা ভিড়ের মধ্যে আত্মগোপন করার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু তর্ক শেষ পর্যন্ত কেউ করলেন না। গ্রামের উৎসাহীরা তর্কাচার্যকে প্রায় জোর করে ঠেলে এগিয়ে দিলেন। উদ্দেশ্য, তুমি এগিয়ে যাও, আমরা পেছনে আছি।

তর্কাচার্য প্রথমে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন কিন্তু পরক্ষণেই একটু কুঁজোর মত হয়ে বললেন :

—স্বামিজী আপনার ভাষণে আমরা খুশী হয়েছি। আপনি যে প্রশ্ন তুলেছেন, তার সমাধান করা আমাদের সাধ্যাতীত। আমাদের ঔদ্ধত্য ক্ষমা করবেন। কেউ যদি আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে পারে সে আপনি নিজে।

তর্কাচার্যের কথা শুনে উপস্থিত গ্রামের অন্যান্য পণ্ডিতগণ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন।*

* ১৯৪২ সালে মৈমনসিং জেলার বাণীগ্রামে সঙ্ঘসন্তানগণ প্রচারে যান। এই প্রচার কার্যে নেতৃত্ব করেন স্বামী বিকাশানন্দজী।

ছত্রিশগড়ির বত্রিশ ছুঁতো

কথায় বলে, 'দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না।'

ছত্রিশগড়ির বত্রিশ ছুঁতো দেখে এই উক্তিটির আক্ষরিক সত্যতার প্রমাণ পাওয়া গেল ঃ

সঙ্ঘসন্তানগণ ঘুরে ঘুরে হোসাঙ্গাবাদ এলেন। নতুন যায়গা। কোথায় উঠবেন ?

শেষে অগতির গতি, সর্বলোকের কোলদাতা ধর্মশালায় উঠলেন। স্থির করলেন, এখান থেকেই প্রচার অভিযান চালাবেন। প্রচাবে বেরিয়ে গেলে একজন ব্রহ্মচারী থাকবেন জিনিষ পত্র ও রান্নাবান্না তদারকের জন্য।

সেদিন যথারীতি কাজে বেরিয়ে গেলেন সন্ন্যাসীগণ। ধর্মশালায় রইলেন একজন ব্রহ্মচারী। সন্ন্যাসীরা নিশ্চিন্ত, ফিরতে দেরী হলেও ক্ষতি নেই। কারণ, ব্রহ্মচারী রয়েছেন ধর্মশালায়। জিনিষ পত্তর ঠিক করে রাখা, গুরুমহারাজের পূজার বন্দোবস্ত করা, সবই পারেন তিনি। হোসেঙ্গাবাদ পরিক্রমা করে সন্ন্যাসীরা ধর্মশালায় ফিরতে দেরী করলেন। কোন রকমে শ্রান্ত ক্লান্ত দেহকে টেনে এনে তাঁরা ধর্মশালায় ঢুকলেন। তাঁরা নিশ্চিন্ত, এতক্ষণে ব্রহ্মচারী রান্নাবান্না শেষ করে ফেলেছেন। কিন্তু নির্দিষ্ট ঘরের কাছে এগুতেই তাঁদের চোখে পড়ল, ব্রহ্মচারী দালানের এককোণে হাত পা গুটিয়ে বসে আছেন। আর তারই অদূরে একজন ছত্রিশগড়ী বত্রিশদাঁতে মুখ খিঁচিয়ে আঞ্চলিক ভাষায় গালাগাল দিচ্ছে। একে দুর্বোধ্য ভাষা তার উপর অপরাধের গুরুত্ব না বুঝে হতভম্ব হয়ে বসে আছেন ব্রহ্মচারী। চোখে মুখে তার অসহায় ভাব ।

সন্ন্যাসীদের দেখে ব্রহ্মচারী মনে বেশ খানিকটা হারানো বল যেন ফিরে পেলেন। ওঠে দাঁড়িয়ে ছত্রিশগড়িকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন, তিনি নিজে সম্পূর্ণ নির্দোষ! কিন্তু অভিযোগকারী কিছুতেই নিরস্ত হচ্ছেন না। তার আরো জিদ চড়ে গেছে। অদূরে দাঁড়িয়ে দুর্দান্ত প্রতিবাদে ক্রমাগত তাণ্ডবনৃত্য করে চলেছে।

দৃশ্যটা দেখে প্রমাদ গণলেন সন্ন্যাসীরা।

—না জানি কি কাণ্ড করে বসেছেন ব্রহ্মচারী। ছত্রিশগড়ি মাঝে মাঝে অঙ্গুলি নির্দেশে মেঝের একটা নির্দিষ্ট যায়গা দেখাচ্ছে। একজন সঙ্ঘ সন্তান নিরুপায় হয়ে এগিয়ে গিয়ে ছত্রিশগড়িকে জিগগেস করলেন হিন্দিতে:

ক্যায়া কসুর হুয়া?

শেষে কোন জবাব না পেয়ে সন্ন্যাসী ব্যাপারটা নিজেই তলিয়ে দেখবার চেষ্টা করলেন। বুঝলেন, ঝগড়াটা রান্নাঘরের সীমানা নিয়ে। ছত্রিশগড়ির নালিশ, সে জলদাগ দিয়ে রেখেছে রান্নার জায়গায় সেই জলদাগ অস্বীকার করে ব্রহ্মচারীর কাঠের জ্বালানীর টুকরা তার চিহ্নিত রান্নার সীমান্ত অতিক্রম করে চৌহিদ্দির ভেতরে পড়েছে। এবং রান্নার সরঞ্জাম ও সুচিতা একেবারে নষ্ট করে দিয়েছে।

—কাঁচা কাঠ যদি চৌহদ্দি পেরিয়ে এক আধ ইঞ্চি ভেতরে গিয়ে পড়ে থাকে তাতে হয়েছে কী? জ্বালানী তখনও কাঁচা ছিল। ওতে সুচিতা নষ্ট হয় না। সন্ন্যাসীদের হয়ে স্বামিজী আস্তেআস্তে বললেন:

স্বামিজীর এ কথায় ছত্রিশগড়ি রেগে তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠল। সে ঘন ঘন চেঁচিয়ে যাত্রীদের শুনিয়ে বলতে লাগল:

—আমার সব জিনিষপত্তর ম্লেচ্ছের ছোঁয়া লেগে নষ্ট হয়ে গেছে, অশুচি হয়ে গেছে। তাই এসব জিনিষ পত্রের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আমার সীমানার দাগ অস্বীকার করেছে, জুলুম করেছে।

স্বামিজী ভাবছিলেন বলবেন, কাঁচা জলের দাগতো মেঝেতে বেশীক্ষণ থাকে না। কিন্তু ভবী ভুলবার নয়। সে বোধ হয় দিব্য চোখে দেখছে সেই চিহ্নিত জলের দাগ দিয়ে চৌকা তৈরি করা যায়গাটা। মেঝের সিমেণ্ট সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চয়ই সেই চিহ্নিত জল শুষে নিয়েছে।

স্বামিজী ছত্রিশগড়িকে আপ্রাণ বোঝাবার চেষ্টা করলেন:

—কাঁচা জিনিষ ধুয়ে নিলেই শুদ্ধ হয়ে যায়। আর হুজ্জুত করে লাভ নেই। ক্ষমা-ঘেন্না করে নাও।

কিন্তু ভবী ভুলবার নয়। সে ঘন ঘন হুঙ্কারে ধর্মশালা কাঁপিয়ে তুলছে। মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে যা বলছে তার মনে হচ্ছে:

—এক্ষুনি আমার জিনিষ পত্রের দাম মিটিয়ে দিতে হবে। নইলে আমি অনর্থ করব।

দাবিটা অভিনব বা অন্যায় হলেও গ্রাহ্য করা ছাড়া উপায় নেই। অগত্যা শান্তির নীতি গ্রহণ করাই স্থির হল। ক্ষতিপূরণ বাবত কয়েকটি টাকা ছত্রিশগড়ির হাতে দিলেন স্বামিজী। নগদ টাকা ছত্রিশগড়ির মাথায় যেন ধূলপড়ার কাজ করল। কিন্তু সদ্য অস্পৃশ্য জিনিষগুলোর দখল ছাড়ল না সে। টাকা ও জিনিস দুই নিল।

• ১৩৩২ সাল। আষাঢ় মাস। সেখানে স্বামী বিরজানন্দের নেতৃত্বে সঙ্ঘ প্রচার-দল গিয়েছিলেন ছত্রিশগড়ের হোসাঙ্গাবাদ।

জবাব

গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপে সন্ন্যাসীর জামা ঘামে ভিজে গিয়েছে। আপাদমস্তক যেন পুড়ে যাচ্ছে। তবুও তাঁর চলার বিরাম নেই। ভক্ত গৃহস্থদের বাড়ী ঘুরে ঘুরে দান, সাহায্য, চাঁদা সংগ্রহ করতে হয়। তাই বিরামবিহীন কাজ। চলার পথে এক ভদ্রলোক হঠাৎ জিগগেস করলেন :

—স্বামিজী এই ভর-দুপুরে ওদিকে কোথায় যাচ্ছেন? ভয়ঙ্কর যায়গা। জীবন বিপন্ন হতে পারে। ওদের লঘু গুরু জ্ঞান নেই। দিন দুপুরে খুন জখম করতে ওরা ভয় পায় না।

স্বামিজী হেসে বললেন :

—আমরা কপর্দক শূন্য সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী। আমাদের উপর রাগ করবে কেন? আর যদি কেউ এমন অপকর্ম করে তবে গুরু মহারাজ দেখবেন

ভদ্রলোক কী বুঝলেন তিনিই জানেন। এদিক ওদিক সতর্ক ভাবে তাকিয়ে গন্তব্য স্থানের উদ্দেশ্যে পা বাড়ালেন।

স্বামিজী দ্রুত পায়ে এগিয়ে চললেন। গলির মুখের কাছে পৌঁছুতেই দুটি যুবক এসে তাঁকে প্রায় একই সঙ্গে কৈফিয়ৎ চাইল :

এখানে এসেছেন কেন? এ পাড়ায় কী প্রয়োজন?

মতলবটা কী?

সব ক'টি প্রশ্নের উত্তর স্বামিজী সংক্ষেপে দিলেন :

—সঙ্ঘের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করতে এসেছি।

ব্যঙ্গের সুরে শব্দটির অনুকরণ করল, প্রথম যুবকটি।

—যিনি যা পারেন তিনি তাই দেন, কারো উপর আমরা জুলুম করিনে। আর এ চাঁদার টাকা দিয়েই দুর্ভিক্ষ, বন্যাত্রাণ, বা দুর্যোগে যারা কষ্ট পায় তাঁদের সাহায্যে করা হয়। নিরন্নকে অন্নদান করা হয়।

দ্বিতীয় যুবকটি ধমকের সুরে বলল :

—ও সব বাজে কথা রাখুন।

—বাজে কথা নয় জোর দিয়ে বললেন স্বামিজী।

আমরা ঘর সংসার ছেড়ে অপরের সেবায় আত্মনিয়োগ করব বলেই সন্ন্যাস নিয়েছি।

রুক্ষভাবে প্রথম যুবকটি বলল :

—জানেন, ইচ্ছে করলে আপনার পাগড়ী-সমেত মাথাটা উড়িয়ে দিতে পারি এই রিভলবারটা দিয়ে এই মুহূর্তে।

রিভলবারটি বার কয়েক স্বামিজীর চোখের উপর ঘুরিয়ে নিয়ে পকেটে রেখে দিল সে। তারপর কঠোর কণ্ঠে জিগগেস করল :

—এখন কোথায় যাবেন ?

স্বামিজী নির্দিষ্ট বাড়ীর কর্তার নাম ও ঠিকানা বললেন।

—চলুন যাই, আসুন আমার সঙ্গে। আদেশের কণ্ঠে বলল, যুবকটি।

স্বামিজী নির্ভয়ে চললেন গৃহস্থের বাড়িটির দিকে। সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে দোতলায় এলেন। বাড়ীর কড়া নাড়তেই গৃহস্থ ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন।

যুবকটি স্বামিজীকে দেখিয়ে তাঁকে জিগগেস করল :

—এ' কে চেনেন ? আপনার সঙ্গে কী সম্বন্ধ ?

যুবকটিকে দেখে হঠাৎ যেন কেমন ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেলেন ভদ্রলোক। প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে আমতা আমতা করতে লাগলেন। ঠিক যেন চিনতে পারছেন না, এমনি ভাব দেখালেন।

স্বামিজী গৃহস্বামীর এ অবস্থা দেখে স্বেচ্ছায় নিজের পরিচয় দিলেন :

—আমি ভারত সেবাশ্রম সংঘ থেকে এসেছি আপনার কাছে। পথে ইনি জিগগেস করলেন, কোথায় যাবেন? বললাম, আপনার বাড়ীর কথা। তাই তিনি সঙ্গে এসেছেন।

গৃহকর্তা ভাল করেই জানেন, এ জাতীয় যুবকরা সহসা আস্তানা থেকে বিনা মতলবে বার হয় না। এবং তারা ইচ্ছা করলেই প্রকাশ্য পথে হাসতে হাসতে যে কোন লোকের প্রাণহানি ঘটাতে পারে। কাজেই সন্ন্যাসীকে জানেন বলে পরিচয় দিয়ে নিজেকে বিপদগ্রস্থ করতে নারাজ তিনি।

যুবকটি ধমকের সুরে দ্বিতীয়বার ভদ্রলোককে জিগগেস করল :

—বলুন চেনেন কি না? এবং কেন আসেন ইনি?

স্বামিজী বুঝলেন ইতস্ততঃ করার কারণটা। তবুও যুবকটির সন্দেহ দূর করার জন্য ভদ্রলোককে উদ্দেশ্য করে সহাস্যে বললেন :

—সত্যি কথা বলতে সংকোচ করছেন কেন?

ভদ্রলোক অস্ফুট শব্দ করে এবং মাথা নেড়ে ইঙ্গিতে বোঝালেন, তিনি স্বামিজীকে চেনেন।

এ জবাবে যুবকটির উগ্রভাব অনেকটা কমল এবং স্বামিজীকে সঙ্গে করে আবার গলির মোড়ে এসে জিগগেস করল :

—গ্রামে কত অসংখ্য দরিদ্র লোক আছে, তা'দের জন্য আপনারা কি করছেন?

—শিক্ষার জন্য স্কুল, চিকিৎসার জন্য সেবায়তন, চাষের বীজ ধানের জন্যও সাধ্যমত আর্থিক সাহায্য করা হয়।

কয়েক সেকেণ্ড কী একটু ভেবে নিয়ে যুবকটি বলল :

—যান, সোজা চলে যান। এদিকে আর কখনও আসবেন না, বুঝলেন ?

স্বামিজী স্মিত হাস্যে বললেন ঃ

—এদিকে আসা না আসা আমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। সঙ্ঘ নির্দেশ দিলে নিশ্চয়ই আসতে হবে। আদেশ লঙ্ঘন আমরা করতে পারিনে। জীবন পণ করে দুঃস্থদের সেবা ও ধর্ম প্রচারের দায়িত্ব নিয়েছি।

এ কথার উত্তর দিতে গিয়ে মুখ বুজে রইল যুবকটি। কেমন যেন একটা ভাবান্তর হল।

নম্র কণ্ঠে বলল, আপনি নিশ্চিন্তে যেতে পারেন।

———

ভক্তির নমুনা

ট্র্যাওয়, ব্রহ্মদেশের ছোট্ট একটি খনি প্রধান শহর।

সংঘ প্রচার দল এসেছেন ঠিক পূজোর আগে। এসেই শুনলেন, স্থানীয় বাঙ্গালীরা দুর্গা পূজা করবে বলে স্থির করেছেন। বাংলার বাইরে সুদূর ব্রহ্মদেশে দুর্গাপূজা। বাঙ্গালীদের মধ্যে একটা আনন্দের সাড়া পড়ে গেল। সন্ন্যাসীরাও খুশী হলেন, বাংলার বাইরে বিদেশে এসেও বাঙ্গালী তাদের পূজা পার্বণ ও উৎসবের কথা ভুলে যান নি।

কুড়ি পঁচিশজন বাঙ্গালীর বাস। সবাই যথাসাধ্য অর্থ দান করতে রাজী। হিসেব করে দেখা গেল যে টাকা চাঁদা উঠবে তা'তে পূজার খরচ কুলিয়ে যাবে। কয়েকজন প্রস্তাব করলেন ঃ

—বাংলা দেশ থেকে কারিগর এনে প্রতিমা তৈরি করান হোক। অন্যরা বললেন ঃ

—না, এবারকার মত স্থানীয় কারিগর দিয়ে ছোট প্রতিমা তৈরি করা হোক। হাতে বেশী সময় নেই। আসচে বার দেশ থেকে সেরা শিল্পী ও পুরোহিত আনা হবে। খুব বড় ঠাকুর তৈরী করে পূজা হবে।

দেখতে দেখতে দু'টি দল তৈরি হয়ে গেল। প্রথম দল জোর দিয়ে বলল ঃ

—এবারই আনতে হবে। এরোপ্লেনে আনতে আর কত সময় লাগবে? টাকা খরচ করলে বাঘের চোখ পাওয়া যায়। অন্যদল প্রস্তাবে রাজী হল না। ফলে দুটো প্রতিদ্বন্দ্বী দল গড়ে উঠল।

প্রথম দল পূজার কাজে এগিয়ে গেল। দ্বিতীয় দল এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত রইল।

খবরটা অন্যান্য বাঙ্গালীদের কাণেও এল। শুনে তাঁরা মর্মাহত হলেন। দেখলেন, 'বিদেশে বাঙ্গালী মাত্রই সজ্জন' এ কথাটা বর্মা মুল্লুকে খাটল না।

প্রথম দলটি যথারীতি পূজার আয়োজন করল। দ্বিতীয় দলটির এতটুকু সহযোগিতা পেল না তারা। কিন্তু নিরাশ হল না। পূর্ণদ্দ্যোমে পূজা শুরু হল। অনুষ্ঠানের কোন ক্রটি রইল না। ষষ্ঠীদিন উদ্বোধন হল, সপ্তমীর পূজাও হল। কিন্তু মহাষ্টমীর দিন দেখা গেল, একদল বর্মী গুণ্ডা এসে পূজা মণ্ডপ ও প্রতিমা ভেঙ্গে তচনচ্ করে দিল। পূজা পণ্ড হয়ে গেল। কেন এমন হল? কারা এই দুস্কর্ম করলো? উৎসাহীরা মুষড়ে পড়লেন।

অপকর্মটি গোপন রইল না।

পূজার অবমাননা দেখে দুঃখিত হলেন সন্ন্যাসীরা। আরো অবাক হলেন জেনে, অতুগ্র প্রতিপক্ষ বাঙ্গালীরা।

---

* স্বামী বিকাশানন্দজী। ঘটনা—১৯৩৭ সাল।

আবাহন-বিসর্জ্জনের দ্বন্দ্বে

সঙ্ঘ-চারণ দলটি নিতান্ত ছোট নয়। জনদশেক সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী আছেন। কিন্তু কোন নির্দিষ্ট আস্তানা নেই। হুগলী ও বর্ধমান জেলার গ্রামগুলোতে ঘুরে ঘুরে কাজ করছেন। এগ্রাম ওগ্রাম করে শেষে তারা এলেন বর্ধমানের 'আহারবেলমা' গ্রামে। ততক্ষণে গ্রামের বুকে সন্ধ্যা নেমেছে। কাজেই রাতের মত একটা আশ্রয় চাই। দলপতি স্বামিজী ভাবলেন কী করা যায়! খবর নিয়ে জানলেন, স্থানীয় ইউয়িন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টের বাড়ী এই গ্রামেই। তিনি ডাক্তার। বাড়ীটা খুঁজে পেতে কষ্ট হল না। ছোট বড় সকলেই তাকে চেনে।

স্বামিজী সদলে এসে হাজির হলেন ডাক্তার বাবুর বাড়ীতে। ততক্ষণে প্রচণ্ড ঝড় এসে গেছে।

ডাক্তার বাবু বাড়ীতে আছেন? চেঁচিয়ে ডাকলেন স্বামিজী। ভেতর বাড়ী থেকে একজন এসে বলল:

—না তিনি এখন ও বাড়ী ফেরেন নি।

—বাড়ী ফেরেন নি জেনেও স্বামিজী অনুরোধ জানালেন:

—রাত্রির জন্য একটু আশ্রয় চাই।

কোন উত্তর না দিয়েই লোকটি চলে গেল ভেতর বাড়ীতে। ঝড়ের ধূলি ঝাপটা এসে গায়ে বিঁধছে সংঘ সন্তানদের। কিন্তু তাঁরা এখন কোথায় যাবেন? তবু বাড়ীর বারান্দায় দাঁড়াবার মত একটু যায়গা আছে। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে আবার চেঁচিয়ে কাতর ভাবে ডাকলেন স্বামিজী:

—দরজাটা একটু খুলুন।

বেশ খানিকক্ষণ ডাকাডাকির পর ডাক্তার বাবু নিজেই বেরিয়ে এলেন।

জিগগেস করলেন ঃ

—কী চাই ?

—রাতের মত একটু আশ্রয়।

—আশ্রয় ? কি একটু ভেবে নিয়ে ডাক্তার বাবু বললেন ঃ

—না, এখানে হবে না। অন্যত্র দেখুন।

—এই ঝড় জলে বেরুবার উপায় নেই।

ঘর যদি নাও পাই ক্ষতি নেই, আপনার এই বাইরের বারান্দাটুকু পেলে ও হবে। আমি কথা দিচ্ছি, ভোর হলেই আমরা চলে যাবো।

ডাক্তার বাবু কথার প্যাঁচে দায় এড়িয়ে যাবার জন্য জবাব দিলেন ঃ

আপনাদের থাকতেও বলি না, যেতেও বলি না।

স্বামিজী কি আর করবেন! যিনি বাড়ীতে থেকেও বলেন, বাড়ী নেই ; তিনি আশ্রয় দিতে অস্বীকার করলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

—স্বামিজী সদলে সেই খানেই বসে থাকলেন কিছুক্ষণের জন্য গৃহস্বামীর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে। অন্য আর এক সন্ন্যাসী বেরুলেন আশ্রয়ের সন্ধানে। তথাপি ঘরে স্থান না হলেও পথ কখন ও অস্বীকার করবে না আশ্রয় দিতে, দুর্ব্যবহার করবে না তাঁদের সঙ্গে। গ্রামের কাঁচা রাস্তা দিয়ে অতি কষ্ট করে চলেছেন। উক্ত আশ্রয় সন্ধানী সন্ন্যাসী। হঠাৎ চোখে পড়ল পথের ধারে একটা ঝাঁপ বন্ধ করা দোকান ঘরের মধ্যে আলো জ্বলছে। দরমার বেড়ার ফাঁক দিয়ে আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে। কাছে গিয়ে স্বামিজী বন্ধ

ঝাঁপের উপর কয়েকবার হাতে টোকা মারলেন। দোকানী ঝাঁপ খুলে সন্ন্যাসীকে দেখে বললেন :

—আসুন, আপনি ভেতরে চলে আসুন। সন্ন্যাসী মাথা গুজবার মত একটু আশ্রয় পেয়ে খুসী হলেন। বললেন :

ব্যাস্ত হবেন না।

কিন্তু দোকানী সন্ন্যাসীর দুরবস্থা দেখে বিচলিত হলেন।

ঘরে একজন বৃদ্ধ গৃহস্থ বসে ছিলেন। তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করতে লাগলেন, কী ভাবে সন্ন্যাসীদের থাকার বন্দোবস্ত করা যায়। শেষে তাঁরা স্থির করলেন, গ্রামের বারোয়ারী মন্দিরে বন্দোবস্ত করার চেষ্টা করবেন। দোকানী ভদ্রলোক তক্ষুণি একটা লণ্ঠন নিয়ে রওনা হলেন বারোয়ারী মন্দিরের সম্পাদকের উদ্দেশ্যে, ঝড় ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করে।

স্বামিজী তার আন্তরিক প্রচেষ্টা দেখে প্রীত হলেন। সামান্য একজন মুদি অথচ মনটা তার কি উদার বড়, অতিথি পরায়ণ।

উপবিষ্ট বৃদ্ধের সঙ্গে কথাবার্তায় পরিচয় পেলেন স্বামিজী। ইনি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট সেই ডাক্তার বাবুরই আপন কাকা। তিনি তাঁর নিজের অসহায় অবস্থার কথা বললেন। খুড়ো-ভাইপো পৃথক অন্ন।

মিনিট পনের পর ফিরে এলেন দোকানী। সহাস্যে বললেন :

—চলুন, আপনাদের থাকার যায়গা হয়েছে বারোয়াড়ী তলার মন্দিরে। ওখানে কষ্ট হবে না। সম্পাদক ও ওখানে গেছেন।

ততক্ষণে ঝড়ের প্রকোপ কমে এসেছে। চারণদলের সবাইকে ডেকে নিয়ে আসা হলো নির্দ্ধারিত স্থানে।

বারোয়ারী মন্দিরটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এরই মধ্যে সম্পাদক কয়েকজনকে দিয়ে মন্দিরটিকে ঝাড় পোচ করিয়ে নিয়েছেন।

সন্ন্যাসী ও স্বেচ্ছাসেবকেরা যথাস্থানে এসে পূজার আসনের যায়গা করে নিলেন।

দোকানী ও সম্পাদক সন্ন্যাসীদের রাত্রের আহারের বন্দোবস্ত করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। দোকানী নিজ ব্যয়ে আটা ঘি ও তৈজসপত্র যোগাড় করলেন। দেখতে দেখতে গ্রামের বহু যুবক ও প্রৌঢ় এসে উপস্থিত হলো, তা'রা নিজেরাই করলো রান্নার বিরাট আয়োজন। স্বামিজী বারণ করেও তাদের নিরস্ত করতে পারলেন না।

ভাবলে সত্যিই অবাক লাগে। যেখানে উপাবসে রাত কাটাবার কথা। সেখানে অভাবিত আশ্রয় ও আহার্য সংস্থান। যেখানে ভাতই জুটবে না সেখানে লুচি মণ্ডা। আহারবেলমায় আহার সঙ্কটের অভূতপূর্ব সমাধান। গুরু কৃপায় অসম্ভব সম্ভবপর হয়।

চারণদল কীর্তনানন্দে মাতলো ভক্ত গ্রামবাসীদের নিয়ে। রাত্রি সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত ক্রমাগত চললো সেই ভজনানন্দ। তারপর ভোজনানন্দের পালা। সন্ন্যাসী ও সঙ্ঘ স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে উপস্থিত ভক্তগণ সহ সবাই প্রসাদ পেলেন। একটা ছোট খাটো উৎসব হয়ে গেল।

পরদিন তাঁরা ভোরে উঠে প্রচার ও সাহায্য সংগ্রহে বেরুলেন। গ্রামবাসীদের সহযোগে শুরুহল প্রচার ও অর্থ সংগ্রহের কাজ। তাদের অকুণ্ঠ সমর্থন পেলেন সঙ্ঘ সন্ন্যাসীরা। গ্রামবাসীরা সবাই সজ্জন, ধর্মপরায়ণ, অতিথিনিষ্ঠ ও বদান্য। সাধুর বেশে বহু ঠগ দস্যুও অনেক সময় গৃহস্থের সর্বনাশে উদ্যত হয়! রাত্রে কোনও অপরিচিত লোককে গৃহে স্থান দিতে অনেকেই দ্বিধাগ্রস্ত হন। ডাক্তারবাবু হয়ত এ ধরণের ভয় ও সন্দেহে সন্ন্যাসী ও স্বেচ্ছাসেবক দলকে গৃহে

স্থান দিতে চান নি। তাই সন্ন্যাসীরা তাঁকে দোষারূপ করবেন কেন? সর্বোপরি এ শ্রীশ্রী ঠাকুরেরই এক মহাপরীক্ষা। সুখ, দুঃখ সম্পদ বিপদ আবাহন বিসর্জনের ভিতর দিয়েই চলে তাঁদের সন্ন্যাস জীবনে মহাসাধনা। সর্ব অবস্থাতেই তাই তাঁরা নির্বিকার ও নিস্পৃহ। *

—

* ১৯৩৯ সালের ঘটনা। স্বামী নির্মলানন্দের কাছে শোনা। দোকানীর নাম শ্রীপঞ্চানন। ইনি পিতৃকার্যের জন্য সঙ্ঘের গয়া তীর্থাশ্রমে গিয়ে আশ্রয় পেয়ে ছিলেন। সেই মহান সঙ্ঘের সন্ন্যাসী ও কর্মীরা বিপন্ন জেনে তক্ষুনি তিনি সর্বশক্তি নিয়ে এগিয়ে আসেন প্রতিকারের জন্য।

সেবা

গ্রীষ্মকাল।

প্রচণ্ড গরম। বাতাস নয় তো যেন আগুণের হল্‌কা। পথিকের সংখ্যা আঙ্গুলের করে গুণে শেষ করা যায়। দৃষ্টির আওতার মধ্যে পড়ে খুব বেশী হলে জন বার।

সবাই ক্ষিপ্রপদে পথ চলচে। ঘর্মাক্ত দেহে একজন নবীন সন্ন্যাসী এসে দাঁড়ালেন বাস ষ্ট্যাণ্ডে। মাথায় গেরুয়া পাগড়ী, হাতে গেরুয়া রঙের থলি। থলির মধ্যে রসিদ পত্র, খাতা। আশ্রমের সদস্যদের নাম লেখা খাতায়। মাসিক চাঁদা আদায় ও আসন্ন সভার ইস্তাহার দেওয়ার দায়িত্ব নিয়ে বেরিয়েছেন সন্ন্যাসী।

এখনও অনেক কাজ বাকী। কাজ শেষ না করে আশ্রমে ফিরে যাবেন না তিনি। দৃঢ় সঙ্কল্প। ক্ষুধা তৃষ্ণার কথা চিন্তা করার অবসর নেই তাঁর।

তবুও মুখে হাসি, বুকে বল। একজন পথিক কঠোর অপ্রিয় মন্তব্য করে চলে গেল, ভণ্ড সাধু।

অযথা, বিনা অপরাধে।

সন্ন্যাসী শুধু হাসলেন। শুনে শুনে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন এমনি মন্তব্য, ঠাট্টা, বিদ্রূপ।

গুরু মহারাজের নির্দেশ, কারোর কথা গায়ে মাখতে নেই। তাই গালমন্দ হেসে উড়িয়ে দিতে হয়। দশের ও দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করলে অনেক গঞ্জনা সহ্য করতে হয় বৈকি!

সন্ন্যাসী ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েচেন একটা গ্যাস পোষ্টের পাশে। বাস কখন আসবে সেই অপেক্ষায়।

অপেক্ষমান যাত্রীদের কেউ কেউ বাস কোম্পানীর উদ্দেশ্যে কটু মন্তব্য করে এগিয়ে গিয়েচে।

কিন্তু সন্ন্যাসী নির্বিকার। ধৈর্য্য তাঁর অসীম। মাইল চারেক দূরে যেতে হবে। তিনি স্থির করেচেন, কাজ শেষ করে ফিরবেন। তাই প্রচণ্ড রৌদ্রের মাঝেও অপেক্ষা করতে হবে।

আর একজন পথিক যাবার সময় মন্তব্য করে গেল। সাধু? সাধুর আবার বাসে চড়ার সখ হয়? যত সব.........

বাস কাছে আসতেই সন্ন্যাসী অভ্যাস বশতঃ হাত তুলে থামাতে বললেন:

একজন মাত্র যাত্রী, তাও আবার সন্ন্যাসী। গ্রাহ্য করলো না ড্রাইভার কন্‌ডাক্টার, বিদ্যুৎ বেগে বেরিয়ে গেল বাসটা সন্ন্যাসীর নাকের উপর দিয়ে।

অধিকন্তু ড্রাইভারের একটা কটূ মন্তব্য কানে এল সন্ন্যাসীর। তাঁকে উদ্দেশ্য করেই বলচে সে।

কিন্তু বেশী দূর যেতে পারলো না বাসটা একটা বিকট আর্তনাদ করে থেমে গেল কয়েকগজ দূরে। পেছনের চাকা বিকল হয়ে গেছে। হুস হুস করে ধূয়া বেরুচ্ছে। গাড়ীর পেছন দিকটা হঠাৎ যেন ঘন মেঘে ঢেকে গেল।

বাসের মধ্যস্থিত যাত্রীদের আর্ত চীৎকার শোনা গেল। কোন কোন যাত্রী লাফিয়ে নেমে পড়ল।

এক্সিডেণ্ট, এম্বুলেন্স বলে কেউ কেউ চেঁচালো। কিন্তু জনতা নিষ্ক্রিয়। এদিক ওদিক ছিটকে পড়ল অনেকে।

সন্ন্যাসী ছুটে এগিয়ে এলেন। কনডাক্টার সন্ন্যাসীকে না দেখেই বললো, ও বেটা সাধুর অভিশাপে এ কাণ্ড হয়েচে। একবার পেলে হয় হাতের মুঠোয়।

সন্ন্যাসী গ্রাহ্য করলেন না তার মন্তব্যকে। এগিয়ে গিয়ে পাজাকোলে করে গাড়ী থেকে নামিয়ে নিয়ে এলেন একে একে

আহতদের। তার পর এলেন ড্রাইভারের কাছে। দেখলেন রক্ত ঝরছে তার আহত দেহ থেকে, কপাল থেকে। গুরুতর আঘাত পেয়েছে সে।

ফুট পাথের উপর অচৈতন্য দেহটাকে এনে কোলে তুলে নিয়ে বসলেন সন্ন্যাসী, ড্রাইভারের মাথাটা। গায়ের গেরুয়া চাদব ছিঁড়ে বেধে দিলেন আহত স্থানগুলো। উদ্দেশ্য, রাস্তার ধুলো বালি থেকে ক্ষতস্থান রক্ষা করা।

এম্বুলেন্স এলো। এম্বুলেন্সের সঙ্গে গিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়ে সন্ন্যাসী ফিরে এলেন আবার পথে।

হঠাৎ তাঁর মনে হল যেন ক্ষুধার উদ্রেক হয়েচে। গেরুয়া পাঞ্জাবীর নীচের পকেটে হাত দিয়ে দেখলেন, পেয়ারাটা ঘামে সপ্ সপ্ করচে। ওটাই তাঁর ভরসা। প্রয়োজনে তুলে নিলেই হবে। আর পিপাসা নিবারণে রয়েচে কলের জল। ওর চেয়ে বেশী কিছু তিনি ভাবতে পারেন না।

একবার সন্ন্যাসী ভাবলেন, ক্ষুন্নিবৃত্তি করে ফেলা যাক্। হাতটা পকেটের দিকে বাড়ালেন।

কিন্তু ফলটা আর বার করা হলো না। সন্ন্যাসী হঠাৎ নিরস্ত হয়ে গেলেন। বাস এসে গেছে। তাইত্রস্তে উঠে পড়লেন তিনি। তাঁর অনেক কাজ এখনও অসমাপ্ত রয়েছে। বাকী থাকলে অবশ্য কেউ অনুযোগ করবে না. ভৎর্সনা করবে না। তবুও তাঁর একজনকে শুধু ভয়। তাঁকে তিনি ঠকাতে চান্না, মিথ্যা কৈফিয়ৎ দিতে চান্না, সান্ত্বনা দিতে চান্না। কে সে মহাত্মা ?

নিজের বিবেক !

* সজ্যকর্মী স্বামী জয়ানন্দজী।

দুর্বলতা

কুমিল্লা জেলার কৃষ্ণপুর গ্রাম। সঙ্ঘ প্রচার দল ঘুরতে ঘুরতে এ গ্রামে এসে হাজির হল। ধর্মপ্রাণ হিন্দু নরনারী সন্ন্যাসীদের আসার খবর পেয়ে খুশী হলেন। বহুদিন যাবৎ এ গ্রামে ধর্ম সভা বন্ধ। গ্রামের হিন্দু জমিদার মুসলমান প্রজাদের তুষ্টি সাধনেই ব্যস্ত। একদল যুবকদের লাগিয়ে দিলেন সন্ন্যাসীদের বিরুদ্ধে। তা'রা ঘুরে ঘুরে প্রচার শুরু করল।

—সাধুরা এসেছে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে দাঙ্গা বাধাবার জন্য। কাজেই সাবধান। জমিদার নিজে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় ও উদাসীন রইলেন সংঘের ধর্ম প্রচার কাজে। উৎসাহী ধর্মপ্রাণ হিন্দুদের মধ্যে নিরুৎসাহের ছাপ পড়ল। একটা বিষাদের ছায়া নেমে এল গ্রামে।

কিন্তু সংঘ সন্তানগণ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। যত প্রতিকূল অবস্থাই হোক না কেন, বক্তৃতা, যাগযজ্ঞ পূজা আরতি করতেই হবে। যদি প্রয়োজন হয় জীবনপণ করতে হবে। তবু নির্দিষ্ট কার্য সূচী ব্যাহত হতে দেবেন না।

যথা সময়ে শুরু হল বক্তৃতা। দলপতি স্বামিজী উদাত্ত কণ্ঠে হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করলেন। বক্তৃতা শেষে হোম-যজ্ঞ শুরু হল। দেখতে দেখতে যজ্ঞস্থান পূর্ণ হয়ে উঠল। ধর্মপ্রাণ—নরনারীদের আনন্দের সাড়া পড়ল। যজ্ঞের উপযোগীতা ও ব্যাখ্যা শুনে তারা খুশী হলেন। মুসলমানরাও এসেছিল দলে দলে। কিন্তু যজ্ঞবারি সিঞ্চনের সময় তারা ধর্মান্তরিত হওয়ার ভয়ে অকুস্থল থেকে সরে পড়েন। কিন্তু এতটুকু গোলমাল বা ঝামেলা করে নি।

অসংখ্য নরনারীর সমবেত কণ্ঠে যজ্ঞের মন্ত্র উচ্চারণে গ্রামটি মুখরিত হয়ে উঠল। হিন্দু নরনারীদের মন তৃপ্তিতে, প্রশান্তিতে

ভরে উঠল। যজ্ঞের পর শুরু হল কীর্তন। খোল করতাল সহ কীর্তনের আওয়াজে ছুটে এলেন আরো অনেকে। কিন্তু এলেন না শুধু একজন হিন্দু সমাজ প্রধান, জমিদার। ঘরের মধ্যে কূপ-মণ্ডকের মত নিজে আবদ্ধ হয়ে রইলেন তিনি। তাঁর অভাবিত আচরণ দেখে অনেকেই বিস্মিত হল। কিন্তু বিস্মিত হলেন না সন্ন্যাসীগণ। তাঁরা নানা ধরণের লোক দেখে অভ্যস্ত। কিন্তু যখন তা'রা খবর পেলেন প্রজা বৎসল জমিদার গ্রামের প্রজাদের জন্য এক বিরাট ভোজের আয়োজন করেছেন তখন সত্যিই বিস্মিত হলেন; খুশীও হলেন। নরনারায়ণের সেবা, সে যে ভাবেই হউক না কেন, তা'র সার্থকতা আছে। তবে এর মধ্যে একটা কিন্তু রয়ে গেল। প্রচুর দই, মিষ্টি, সন্দেশ ভারে-ভারে গ্রামে এল তৃপ্তির জন্য।

—স্বামিজী গ্রামে একজন ভদ্রলোককে ডেকে জিগগেস করলেন:

—জমিদার কী মাঝে মাঝে প্রজাদের ভোজে আপ্যায়িত করেন?

উত্তরে ভদ্রলোক বললেন:

—না, কখনও নয়।

—তবে, এবার যে করলেন?

হেসে উত্তর দিলেন ভদ্রলোক।

—অনেকটা দায়ে পড়ে। তাঁর আশংকা আপনাদের আগমনে মুসলমান প্রজারা যদি বিগড়ে যায়। তাই, তা'দের খুশী করার চেষ্টা। ভূরি ভোজে তুষ্ট রাখা। হিন্দুরা বাদ। পরাক্রান্ত জমিদারের একি অদ্ভুত ভীতি ও দুর্বলতা!

* ১৯৪৩ সালে স্বামী বিকাশানন্দজীর নেতৃত্বে সঙ্ঘের চারণ দলটি কৃষ্ণপুর গ্রামে গিয়ে ছিল।

প্রসাদ

সে বছর পুরীর রথযাত্রা দেখে ফিরছেন সংঘের আচার্যদেব। সঙ্গে তাঁর কয়েকজন সংঘ সন্তান। প্ল্যাটফর্মে বিরাট ট্রেণ দাঁড়িয়ে। কামরার বাইরে ধর্মপ্রাণ তীর্থযাত্রীদের জটলা। তাঁ'দের কৌতূহলের সীমা নেই। মাঝে মাঝে জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখছেন তাঁ'রা। আচার্যদেব কী করছেন, কার সঙ্গে কথা বলছেন ?

কিন্তু চোখে পড়ল, আচার্যদেব বিরাট একটা হাঁড়ি থেকে থাবলা দিয়ে সাদা ছানার মত কী সব বার করছেন। দু একজনকে দিচ্ছেন, মৃদু মধুর হাসছেন।

জল ছানাই হবে। জল ছেঁকে ছেঁকে তুলছেন। কামরার ভেতরে সকলেরই প্রসন্ন ভাব। গুরুর হাতে প্রসাদ পাচ্ছেন বলে। কামরার বাইরে প্ল্যাটফর্মে উৎসুক ব্যক্তিগণের কেউ কেউ ওই প্রসাদ লাভে আগ্রহশীল কিন্তু ভীড় ঠেলে ভেতরে যাওয়ার উপায় নেই। দরজায় অসম্ভব ভীড়। কাজেই নিরাশ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ভীড়ের মধ্যে কে একজন হঠাৎ বলে উঠল :

—হাড়ি ভরতি ছানা, সাধু মহান্ত ছাড়া আর কার ভাগ্যে জুটবে। বড়দের বড় আড়ম্বর, বড় রকমের আহার, প্রাচুর্যের বিলাস। যত সব কঠোরতা গরীবের বেলায়।

এ রকম উক্তি আরো কয়েকজন করল। উপস্থিত অপরিচিত যাত্রীরা উপভোগ করল তা'দের মন্তব্য।

—সাধু মহারাজ আর রাজা মহারাজের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। দুই-এরই আড়ম্বরপূর্ণ জীবন। একজনের জন-সমাজের মধ্যে, অপর জনের সমাজের নেপথ্যে রাজপ্রাসাদে।

কথাগুলো ট্রেনের জানালা ভেদ করে আচার্যদেব বা ভক্তদের কানে পৌঁছুল না। ষ্টেশনের কোলাহলে ডুবে গেল কিন্তু নিকটস্থ যাত্রীদের কাণ এড়াল না।

একজন ভক্ত প্রতিবাদ জানালেন :

—না, সাধু মহারাজগণ একেবারেই আড়ম্বর প্রিয় নন। অধিকন্তু চরম কষ্টসহিষ্ণু। তাঁদের সম্বন্ধে না জেনে এমন অপ্রিয় মন্তব্য করা ঠিক নয়।

যান যান মশাই, দালালী করবেন না, বলে আর একজন কটু মন্তব্য করল। আমরা যা বলেছি ঠিক বলেছি। জীবনে ঢের ঢের সাধু সন্ন্যাসী দেখেছি। পরের পয়সায় লাল টুস টুসে চেহারা রেখেছে।

ভক্ত ভদ্রলোক রাগতভাবে চেঁচিয়ে বলে ওঠলেন :

—আপনাদের অভিযোগ সব মিথ্যে। আসুন, জানালার কাছে এসে ভাল করে তাকিয়ে দেখুন কী খাচ্ছেন আর ভক্তদের দিচ্ছেন। আচার্য প্রণবানন্দজী মহারাজ!

সোৎসাহে অভিযোগকারিদের একজন জানালার কাছে ভীড় ঠেলে এগিয়ে গেল, ভাল করে লক্ষ করে দেখল; ছানা হাত দিয়ে ছেঁকে তুললে যেমন আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে জল গলিয়ে যায় ঠিক তেমনি আচার্যদেবের হাতের আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে জল গলিয়ে নীচে পড়ছে। কিন্তু ছাঁকা জিনিষটা ছানা ছাড়া আর কি হবে?

হঠাৎ ভ্রমটা চোখে ধরা পড়ল, ছানাপ্রসাদ তো এরকম হয় না। এযে পকড় ভাত, ওরফে পান্তাভাত।*

*আচার্যদেব—সঙ্ঘনেতা শ্রীশ্রীপ্রণবানন্দজী মহারাজ।